মৎস্য সপ্তাহ '৯৭

১৬-২২ সেপ্টেম্বর

সংকলন

খাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য পেতে চাষ করুন মাছ সব জলাতে

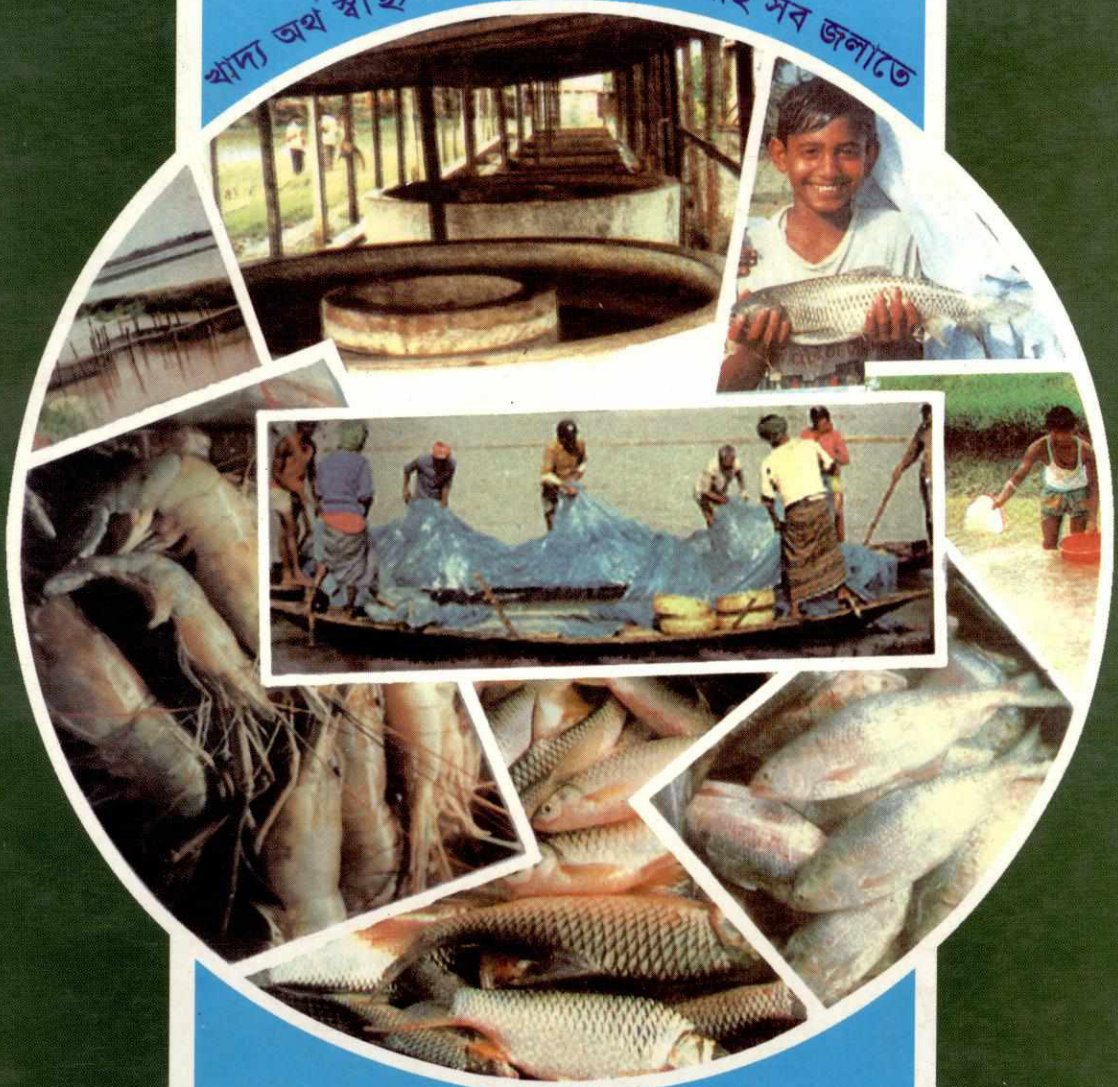

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি

মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ সংকলন

১৬ - ২২ সেপ্টেম্বর

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য সপ্তাহ '৯৭
সংকলন

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ পরিচালক(অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	সভাপতি
মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ রফিকুল ইসলাম উপ পরিচালক	সদস্য
মোঃ আব্দুল খালেক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল	সদস্য
ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন উপ প্রধান	সদস্য
মোঃ ইসমাইল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মাহমুদুল হক সহকারী প্রধান	সদস্য
মোঃ আবু বক্কার সিকদার প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মনিরুজ্জামান সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম তথ্য অফিসার	সদস্য
মোঃ লিয়াকত হোসেন যুগ্ম-সম্পাদক	সদস্য
এস এন চৌধুরী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

আর্থিক সহায়তা

বৃটিশ সরকারের ডি এফ আই ডি

প্রচ্ছদ

নজরুল ইসলাম তাপস

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইন

রমেন চন্দ্র হালদার
সৈয়দ সাঈদুল হক
মোঃ নাজমুল আহসান
মোঃ খোরশেদ আলী

প্রচার সংখ্যা

১০,০০০
(সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণে ঃ কারসাফ প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ

২৫, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৫০২৪১৪, ৮৬৪২৯১

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০১ আশ্বিন ১৪০৪
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

বাণী

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে নিজস্ব সম্পদের সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট হওয়া সকলের কর্তব্য। এই প্রেক্ষাপটে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও "মৎস্য সপ্তাহ '৯৭" উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও মৎস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সাথে সাথে মৎস্য চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহ বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি "মৎস্য সপ্তাহ '৯৭" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ আশ্বিন ১৪০৪
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

বাণী

প্রাণীজ আমিষ সুষম খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান এবং মৎস্য সম্পদ হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান উৎস। মৎস্য আমাদের পুষ্টি চাহিদাই শুধু পূরণ করে না, এটি জীবিকারও এক প্রধান উৎস। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র মৎস্য সম্পদ। এই জলজ সম্পদ বৃদ্ধি ও তার আহরণে আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে অবদান রেখে আসছে। আমরা আশা করি, তাদের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে আরও ব্যাপক হবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আমি মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতি মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০১ আশ্বিন ১৪০৪
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

বাণী

কৃষি নির্ভর আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের বিস্তৃত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীকে সামনে রেখে মৎস্য চাষকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার জন্য মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাক্কালে এ প্রয়াস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও বৃদ্ধি সব কিছুই নির্ভর করে জনগণের সম্পৃক্ততার উপর। মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। এ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে করণীয় বিষয়ে জনগণকে ধারণা প্রদান করতে পারলে এবং জনগণ তা প্রয়োগ করে দেশের সকল জলাশয় মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি মনে করি।

আমি মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সতীশ চন্দ্র রায়

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০১ আশ্বিন ১৪০৪
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

বাণী

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে মৎস্য সম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে, কর্মসংস্থানে, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।

সময়ের আবর্তে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে "মাছে ভাতে বাঙালী" প্রবাদ ভুলে যাবার উপক্রম হলেও সময় এসেছে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর করে সমস্যা উত্তরণের। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার।

আমার বিশ্বাস, বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও "মৎস্য সপ্তাহ '৯৭" এর কর্মপ্রবাহ মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ডে জনগণকে উদীপ্ত ও উজ্জীবিত করবে। "খাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য পেতে চাষ করুন মাছ সব জলাতে" এ বৎসরের এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ এর সফলতা কামনা করছি।

(আইয়ুব কাদরী)
সচিব

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎস্য খাতের বহুমুখী কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ সেক্টরকে উন্নয়নের অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বর্তমানে এ সেক্টরের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির গতিধারা সন্তোষজনক বিধায় ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে আপামর জনগণকে সচেতন করে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সনে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে দেশব্যাপী মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের ঘোষণা দেন। মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে এ বছরও দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবারের মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় 'উৎপাদন ও কর্মসংস্থান' সকল স্তরের জনগণের নিকট উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে মৎস্য বিষয়ক বিশেষ সংকলন প্রকাশ করে সৌজন্যমূলক বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

সংকলনটিতে সকল স্তরের পাঠক সমাজের জন্য বিশেষ করে মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য রপ্তানিকারক, মৎস্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী, নীতি নির্ধারকদের উপযোগী করে বিজ্ঞানসম্মত, তথ্য সম্বলিত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ সহজবোধ্য করে উপাস্থাপন করা হয়েছে। যাদের উদ্দেশ্যে এ আয়োজন, তাদের উপকারে এলে এর প্রকাশ স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

অল্প সময়ে এবং স্বল্প সম্পদের মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গসহ মৎস্য সেক্টরের যে সব কর্মী নিরলস শ্রম দিয়েছেন তাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন। বৃটিশ সরকারের ডি.এফ.আই.ডি. আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় সংকলনের প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ লিয়াকত আলী)
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা

সূচি

১.	মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ❑ মোঃ লিয়াকত আলী	১
২.	মাছের সম্পূরক খাদ্যের গুরত্ব এবং ব্যবহার ❑ ডঃ এম. এ. মজিদ	৭
৩.	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ভূমিকা ❑ গোলাম মূর্তাজা	১৩
৪.	বাংলাদেশের ট্রলিং শিল্প ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ❑ মোঃ মাসুদুর রহমান ও মোঃ মাহমুদুল হক	১৯
৫.	প্লাবন ভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ❑ মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	২৩
৬.	উন্নতমানের পোনা উৎপাদনে ব্রুড মাছ সমস্যা ও সমাধান ❑ এস. এন. চৌধুরী	২৭
৭.	পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল ও কার্যক্রম ❑ মোঃ নজরুল ইসলাম	৩২
৮.	বর্জ্য পানিতে মাছ চাষ ❑ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ও আনোয়ারা বেগম শেলী	৩৭
৯.	মৎস্য খাতে ঋণ প্রদান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ❑ মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	৪০
১০.	অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের দর্শন ও কেইস ষ্টাডিজ ❑ মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, মোঃ সামছুল কবির, মোঃ আব্দুর রহমান ও এস,এম, নাজমুল আলম	৪৬
১১.	কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা ❑ মোঃ রফিকুল ইসলাম ও এস,এ, শামীম আহ্মাদ	৫৩
১২.	হামিল বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ❑ মোঃ আব্দুল খালেক	৫৬
১৩.	মাছের খাবার তৈরী ও ব্যবহার পদ্ধতি ❑ ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দীন	৫৯
১৪.	বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ, সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধান ও সম্ভাবনা ❑ মোঃ রেজাউল করিম ও হাবিবুর রহমান খন্দকার	৬৩
১৫.	বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বনাম পরিবেশ বিপর্যয় ❑ অর্জুন চন্দ্র চন্দ	৬৮
১৬.	চিংড়ির হোয়াইট স্পট রোগ সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ❑ মোঃ আবু বক্কার সিকদার	৭৩
১৭.	মাছের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার ❑ মোঃ আবুল হাশেম (সুমন)	৭৮
১৮.	প্রযুক্তি হস্তান্তরে গণমাধ্যমের ভূমিকা ❑ মোঃ আমিনুল ইসলাম	৮৪
১৯.	আদর্শ মৎস্য গ্রাম ঃ একটি সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণ কার্যক্রম ❑ ওয়াহিদুন নবী ও মেহেরুল ইসলাম	৮৯
২০.	মৎস্য বিষয়ক প্যাকেজ প্রযুক্তি❑ মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া	৯৫
২১.	মাছ চাষের সহজ কলাকৌশল ❑ মোঃ জহিরুল হক	৯৭
২২.	মাছ চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্তি স্থানের তালিকা ❑	১০০
২৩.	প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বরের তালিকা ❑	১০৩
২৪.	মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচী	১০৯

মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

মোঃ লিয়াকত আলী
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য । জাতীয়, পুষ্টি, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রানীজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে । প্রায় ১২ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে এবং ১.২ কোটি লোক খন্ডকালীনভাবে অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ লোক তাদের জীবিকা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতে নিয়োজিত আছেন । দেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৭.৭৫ শতাংশ আসে এই সেক্টর থেকে । জাতীয় আয়ের ৫.০০ শতাংশ এবং কৃষি-সম্পদ থেকে আয়ের প্রায় ১৬.৭ শতাংশ মৎস্য-সম্পদের অবদান । সরকার এই সেক্টরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিবেচনা করে মৎস্য খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে গণ্য করছে । সমন্বিত উপায়ে মৎস্য-সম্পদ উন্নয়নের প্রয়াসকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে একটি খসড়া "জাতীয় মৎস্য-সম্পদ নীতি" প্রণয়ন করা হয়েছে । খসড়া নীতিটি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে । দেশের মৎস্য-সম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের কাজে জড়িত সরকারী বেসরকারী সংস্থার মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে ।

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ পানি সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ । প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের যেমন বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে, তেমনি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক এলাকা । অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর; এর মধ্যে প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর। তটরেখা (৪৮০ কিলোমিটার) বরাবর ২০০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার । বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশীয় ও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। সমুদ্র-এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, কাঁকড়া, ঝিনুক, শৈবাল ইত্যাদি রয়েছে। বিভিন্ন জরীপের মাধ্যমে সামুদ্রিক জলাশয়ের মজুদ ও চিংড়ি সম্পদের একটি হিসেব পাওয়া গিয়েছে

মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যাবলী

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য হ'লো, মৎস্য-সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মিটানো, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা, পল্লী-অঞ্চলের বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য-সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা । রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর এ-সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে আসছে ।

মূলত: সম্প্রসারণ প্রযুক্তি হস্তান্তর, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এ-সব কর্মকান্ডের জন্য চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মৎস্য অধিদপ্তরের ৬টি নতুন প্রকল্পসহ মোট ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬.৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৪২.২৭ কোটি টাকা বরাদ্ধ রয়েছে ।

উন্নয়ন কৌশল

ক. বদ্ধ জলাশয়ে মাছচাষ

দেশে মাছচাষ উপযোগী ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর দীঘি-পুকুর ও ৫৪৮৮ লক্ষ হেক্টর বাওড় ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় অসংখ্য বদ্ধ জলাশয় রয়েছে । কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছচাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারী পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে দীঘি-পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত আছে ।

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে হেক্টর প্রতি বছরে ৩.৫-৭.০ টন মাছ এবং মাছ-চিংড়ির মিশ্রচাষে ৩টন মাছ ও ৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে । আরও কতিপয় নতুন জাতের মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ-পদ্ধতি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলছে । বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর মাছচাষের উদ্দেশ্যে সরকারী জলাশয় সংস্কার ও উন্নয়ন করছে । এই কর্মসূচির আওতায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারী পুকুর/জলাশয়ও সংস্কার করা হচ্ছে । একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ এলাকায় ১৮ টি সেচখাল ও বরোপিটে সমন্বিত মৎস্যচাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে । এই কার্যক্রমে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গরীব ও দু:স্থ মহিলাদের মাছচাষে নিয়োজিত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরকে কার্যক্ষম করে তুলতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । প্রাতিষ্ঠানিক মৎস্য ঋণ পদ্ধতি সহজীকরণের ও সুদের হার যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । বিগত কয়েক বছরে মিঠাপানিতে গলদা চিংড়ির চাষ একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে প্রায় ১১৬৩৩ হেক্টরে গলদা চাষ হচ্ছে । গলদার চাষ সম্প্রসারণ ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গলদা চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং গলদার পোনা সহজলভ্য করার জন্য বেসরকারী পর্যায়ে গলদা হ্যাচারী স্থাপনে সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে।

খ. উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ

বিগত বছরগুলোতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়িচাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে । চিংড়ি খামারের সংখ্যা এবং চিংড়ির উৎপাদন ও রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । চিংড়ি খামারের আয়তন ১৯৮৪-৮৫ সালের ৬৪,০০০ হেক্টরের স্থলে ১৯৯৪-৯৫ সালে ১,৩৮,০০০ হেক্টরে দাঁড়ায় এবং চাষ হতে চিংড়ির উৎপাদন ৭,৫৭৮ টন থেকে ৩৪,০৩০ টনে উন্নীত হয়। চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারী স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে । ইতোমধ্যে আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষযোগ্য এলাকা নির্বাচন ও হ্যাচারী জোন চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে । আহরণের পর চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০টি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে । চিংড়িচাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এতদসংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় এবং কক্সবাজার ও খুলনায় দু'টি আঞ্চলিক চিংড়ি-বিষয়ক সেল স্থাপন করা হয়েছে । এসব সেলে চিংড়িচাষী ও চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনকারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । গত বছর উপকূলীয় চিংড়ি চাষ এলাকায় চায়না ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে । এতে চিংড়ি খামারগুলো ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয় । একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই এ-রোগ প্রতিহত করা যেতে পারে । এই প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে চিংড়িচাষ, আহরণোত্তর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, চিংড়ি

রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের উপর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে । একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ৫৯,০০০ জন চিংড়িচাষী/উদ্যোগক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

গ. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় ও সামুদ্রিক এলাকার বিগত কয়েক বছরের মৎস্য উৎপাদনের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অন্যান্য জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে । অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের নিম্নগতি রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে - মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ মজুদ, মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ, নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং মৎস্য অভয়াশ্রয় স্থাপন । পোনা মাছ অবমুক্তি কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত বিভিন্ন জলাশয়ে বিগত ৫ বছরে প্রায় ৪৫ কোটি রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে । ইতোমধ্যে কর্মসূচির সুফল পাওয়া গিয়েছে । ১৯৯০-৯১ হতে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । দেশের মৎস্য-সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত ১৯৫০ সালের 'মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন' প্রয়োগের মাধ্যমে নলামাছ ও ইলিশ মাছের বাচ্চা (জাটকা) নিধন ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এই আইনটি সময়োপযোগী করে সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে । ১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত 'নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার' আওতায় লাইসেন্স প্রথা চালুর মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সরাসরি সম্পৃক্ত করে ২৫২টি জলমহাল পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়। এই নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে । ১৯৯৫ সালে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলমহালের ইজারা প্রথা বিলুপ্তি সহ এই নীতিমালার কার্যকারিতা বিলোপ করেন । সম্প্রতি ১৩টি বদ্ধ জলমহাল এই নীতিমালার আওতায় পুন: ন্যস্ত করা হয়েছে । মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা এবং মৎস্য-সম্পদের জীব-বৈচিত্র্য বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি থানায় কমপক্ষে একটি জলাশয়কে মৎস্য অভয়াশ্রয় হিসেবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রস্তাবটি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে । দেশের অভ্যন্তরীণ সরকারী জলাশয়গুলোকে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় আনয়ন এবং বর্তমানে প্রচলিত স্বল্প-মেয়াদী ইজারা প্রথার পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদন-ভিত্তিক ইজারা প্রথা প্রবর্তনের লক্ষ্যে খসড়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে । খসড়া নীতিমালাটি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে ।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ের মোট আয়তন ১,৬৬,০০০ বর্গ-কিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের চেয়েও বেশি । এই জলাশয় থেকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ আসে । এই বিশাল জলরাশির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় মাছ আহরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় তা নিম্নরূপ :

- সমুদ্রের কোন্ এলাকায় বছরের কোন্ সময়ে কি ধরণের কত পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি পাওয়া যায় তার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় ।
- সামুদ্রিক মৎস্য আইনের আওতায় ট্রলার, যান্ত্রিক নৌযান ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় ।
- ফিসিং ভেসেলের রেজিষ্ট্রেশন মার্কেন্টাইল মেরিন বিভাগ থেকে জারী করা হয় । উক্ত রেজিষ্ট্রেশনের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তর ফিসিং লাইসেন্স জারী করে থাকে ।
- সার্ভেল্যান্স চেক পোষ্টের মাধ্যমে ফিসিং ভেসেলের বৈধ কাগজপত্র, আহরণ-তথ্য পরিবীক্ষণ করা হয় ।

এ যাবৎ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরে মাছের আনুমানিক মজুদ নিম্নরূপ :

সম্পদ	মজুদের পরিমাণ (টন)	সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য পরিমাণ (টন)
চিংড়ি	১৪,০০০	৬৫০০-৭০০০
তলদেশীয় মৎস্য	১৫০০০০-১৬০০০০	৫০০০০-৮৫০০০
পেলাজিক মৎস্য (উপরি ভাগের মৎস্য)	৯০০০০-১২০০০০	নির্ণয় করা হয়নি

এই তথ্যসমূহ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু জরীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা আবশ্যক; যাতে বর্তমান অবস্থায় সর্বোচ্চ পরিমাণ মাছ আহরণ করা যায় । সম্পদের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে ৭৩টি ট্রলার, ৮০০০ যান্ত্রিক নৌকা এবং প্রায় ১৪,০০০ অযান্ত্রিক নৌকা দ্বারা মাছ ধরা হয় ।

মৎস্য উৎপাদন ও রপ্তানী

মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম গ্রহণ, মাঠ-পর্যায়ে মাছচাষের উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে বিগত বছরগুলোর প্রতি বছরেই মাছের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । ১৯৯১-৯২ সালে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯.৫২ লক্ষ টন । ১৯৯৬-৯৭ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৭৩ লক্ষ টনে । পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২০.০০ লক্ষ টন নির্ধারণ করা হয়েছে । এই পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে বিনিয়োগ সহায়তার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে :

১. জাতীয় মৎস্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসুচি

দেশের মৎস্য-সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৎস্য সেক্টরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষিত লাভজনক ২৩টি প্রযুক্তি প্যাকেজ উন্নয়ন করা হয়েছে । এ সমস্ত প্রযুক্তি প্যাকেজ সম্পর্কে নিবিড় প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা সম্ভব । এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।

২. সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প

দেশের বিভিন্ন সংস্থার অধীনে অনেক খাস জলাশয় অব্যবহৃত আছে । এই সমস্ত জলাশয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে অগ্রিম মূলধন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সীমিত আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে । এই প্রকল্প ব্যাপক-ভিত্তিক করে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে ।

৩. চিংড়ি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

চিংড়ি রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ আছে । বর্তমানে চিংড়ি খামারের মালিকগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে মাত্রায় চিংড়ি উৎপাদন করে থাকে অবকাঠামোগত সাধারণ সুবিধাদি সরকারী পর্যায় থেকে দেয়া হলে উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে । এই লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের সুবিধাদি প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে ।

মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য-সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ ও তা হতে অর্জিত রপ্তানী আয়ের উর্দ্ধমূখী গতিধারা অব্যাহত রয়েছে । রপ্তানী আয়ের ৮০-৮৫ শতাংশই হ'ল চিংড়ির অবদান । ১৯৯৫-৯৬ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩৮৯২৯ টন এবং আয় ছিল ১৩৪০.৯৪ কোটি টাকা । ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪১,৫৪৯ টন রপ্তানীর বিপরীতে ১৪৫৭.৪১ কোটি টাকা আয় হয়েছে ।

বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য-সামগ্রীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

সরকার মৎস্য সম্পদের অবস্থা উপলব্ধি করে উহা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে । বর্তমান কালে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সম্পদের উন্নয়ন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে । বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে ।

জলাশয়ের প্রকৃতি ও প্রকার ভেদে মৎস্য-সম্পদ উন্নয়ন/উৎপাদনের কৌশল ভিন্ন । বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাধ্যমে এবং মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাধারণত: মৎস্য-সম্পদ উন্নয়ন/উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় । এই আলোকে নিম্নলিখিত কলা-কৌশল হাতে নেয়া হয়েছে ।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

১. সুষ্ঠু মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণে মৎস্য আহরণ ।

২. নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ।

৩. মৎস্য আইন বলবৎ (জোরদার) করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহয়তা করা ।

৪. নদী বা যে-কোন প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা আহরণ বন্ধ বা সীমিতকরণ ।

৫. সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ/পানি নিষ্কাশন প্রকল্প, সড়ক ও রাস্তা ঘাট নির্মাণের পূর্বে মৎস্য-সম্পদের উপর তার প্রভাব পর্যালোচনা করা এবং মৎস্য-সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতি নিরুপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৬. কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ।

৭. মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন নদ-নদীতে বিশেষ উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রয় স্থাপন ।

৮. মাছ ও চিংড়ির প্রজননক্ষেত্র ও প্রাথমিক স্তরে এদের বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ করা ।

৯. সম্ভাব্য নদ-নদী, খাল-বিলে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতির প্রচলন করা ।

বদ্ধ জলাশয়

১. দেশে চাহিদামত মৎস্য বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(ক) বেসরকারী পর্যায়ে এই প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ।

(খ) হ্যাচারী নির্মাণে সরকার ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিশ্চিতকরণ ।

২. উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ প্রযুক্তি চাষীদের মাঝে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রসারণ ।

৩. পুকুর উন্নয়ন আইন বলবৎ করার মাধ্যমে দেশের দিঘী-পুকুরসমূহে মাছচাষ বাধ্যতামূলক করা ।

৪. মৌসুমী জলাশয়ে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ ।

৫. দেশী-বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল ও ফলনশীল মাছ চাষে জনগণকে উৎসাহিত করা ।

৬. থানা পর্যায়ে মাছ চাষে বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর প্রর্দশনী খামার পরিচালনা ।

৭. মহিলা সমাজকে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কাজে অর্ধেক হারে যুক্ত করা; বিশেষ করে বাড়ী সংলগ্ন ছোট পুকুর-ডোবায় মহিলাদের মাছচাষে উদ্বুদ্ধ করা ।

৮. কৃষি ও পশু সম্পদের সাথে মাছ চাষের (যেমন- ধান ক্ষেতে মাছচাষ) সমন্বয় সাধন করা ।

৯. উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে চিংড়ি উৎপদনে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ ।

সামুদ্রিক মৎস্য

১. সমুদ্রে মৎস্য-সম্পদ জরীপের মাধ্যমে Sustainable yield নির্ধারণ করা এবং সে হারে মৎস্য আহরণ ।

২. চিংড়ি সহ কতিপয় মাছের প্রজননক্ষেত্রে বছরের নির্দিষ্ট একটি মৌসুমে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা ।

৩. গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ জোরদার করা ।

মৎস্য রপ্তানী সম্প্রসারণ

১. উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ।

২. আহরণ ও হ্যান্ডলিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ।

৩. মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও "হ্যাসাপ" প্রথা প্রবর্তন।

৪. রপ্তানী সহায়ক নীতিমালা প্রহণ ।

৫. নতুন বাজার সৃষ্টি ।

উপসংহার

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য দারিদ্র একটি বিরাট সমস্যা । দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মাছচাষে ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে পারলে তা একদিকে যেমন বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে গ্রামীণ পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনও বহুলাংশে সম্ভব হবে । এছাড়া, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । গণতান্ত্রিক সরকার যথাযথ গুরুত্বসহকারে মৎস্য-সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । সরকারের পাশাপাশি দেশের জনগণ, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মৎস্যচাষ কার্যক্রম প্রহণ করে কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করে মাছচাষকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে পারেন ।

মাছের সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব এবং ব্যবহার

ডঃ এম.এ. মজিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মৎস্যসম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনের ৪ ভাগ, রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ এবং আমাদের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৮০ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে । প্রায় ১২ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে এবং এক কোটি লোক তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতে নিয়োজিত আছে। মুক্ত জলাশয়ে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ, বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি, শস্যক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার, পানির অপরিণামদর্শী ব্যবহার ইত্যাদি কারণে দেশের স্বাদুপানির মাছের উৎপাদন আশানুরুপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না । অথচ দেশের বিস্তৃত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে । এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালে যেখানে মাছের মোট উৎপাদন বৎসরে ৮,২০,০০০ মেট্রিক টন ছিল সেখানে ১৯৮২ সালে তা নেমে এসে দাড়িয়েছিল ৬,৪৬,০০০ মেট্রিক টন । ফলে মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে । ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশের মানুষের দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ছিল যেখানে ৩৩ গ্রাম সেখানে ১৯৮৪ সালে ২১ গ্রামে এসে দাড়িয়েছিল এবং এই অবস্থার এখনও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি । অথচ বাংলাদেশে চাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বিপূল সম্ভাবনা রয়েছে । সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে দেশে বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক জলাশয়ে আধা-নিবিড়/ নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং বর্ধিত জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব । মুক্ত জলাশয় হতে মাছ আহরণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । অধিক মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে তাই আমাদেরকে বদ্ধ জলাশয়ে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে মাছ চাষ করতে হবে । আশার কথা, ইদানিংকালে মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং এর ফলে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে । বর্তমানে মাছের উৎপাদন প্রায় ১২,০০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে । তবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে খাদ্য সরবরাহের কার্যকারীতা নির্ভর করে খাদ্যের পুষ্টিমান, খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ, প্রয়োগ কৌশল, খাদ্য গ্রহণের মাত্রা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির উপর ।

ইহা মনে রাখা দরকার যে, অধিক উৎপাদনের জন্য শুধু ভাল বীজ বা ভাল পোনাই যথেষ্ট নয় বরং উন্নতমানের খাদ্য ও উপযুক্ত চাষ ব্যবস্থাপনা এ ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে ।

সম্পূরক খাদ্য কি?

মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাহির হতে যে সব বাড়তি খাদ্য দেয়া হয় তাকে সম্পূরক খাদ্য বলে । আবার মাছের পুষ্টি চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সঠিক মাত্রায় পুষ্টি চাহিদা পূরণকল্পে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রয়োজনীয় আনুপাতিক হারে ব্যবহার করে যে খাদ্য তৈরি করা হয় তাকে সুষম সম্পূরক খাদ্য বলে । সুষম খাদ্যে প্রয়োজনীয় ছয়টি খাদ্যোপাদানই (আমিষ, সেন্হ বা তৈল, খণিজ লবণ, ভিটামিন এবং পানি) পরিমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিশমিল ইত্যাদি সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় । বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদন দিয়ে তৈরি পাউডার বা দানাদার পিলেট (বড়ি) এবং হাতে তৈরি গোলাকার আদ্র মণ্ড আকৃতির খাবারও মাছের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ । অন্যান্য প্রাণীর মত মাছকেও বেঁচে থাকা ও দ্রুত বড় হওয়ার জন্য পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয় । সুষম পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া মাছের সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব নয় । পুকুরে স্বাভাবিকভাবে মাছের যে প্রাকৃতিক খাবার থাকে তা মাছ চাষে অধিক উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয় । মাছের অধিক উৎপাদন পেতে হলে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয় । সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে উৎপাদন অধিক বৃদ্ধি পায় বলে মাছ চাষও অধিক লাভজনক হয়ে উঠে ।

যে সব কারণে মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে তা হলো ঃ

১। অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছ চাষ করা যায় ।
২। অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থ্য ও সবল পোনা তৈরি করা যায় ।
৩। পোনা বাঁচার হার অনেক বেড়ে যায় ।
৪। মাছ চাষে মৃত্যুহার অনেকাংশে হ্রাস পায় ।
৫। মাছ পুষ্টির অভাব জনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে ।
৬। মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ।ফলে মাছ অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পায় ।
৭। মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিৎ করে ।
৮। কম সময়ে অল্প পরিমাণ জলাশয় হতে অধিক মাছ ও আর্থিক মুনাফা পাওয়া যায় ।

আমরা জানি, জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বা প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি । এর পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে মাছের মজুদ হার এবং উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায় । বর্তমানে বাংলাদেশের পুকুর-দীঘিতে হেক্টর প্রতি মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ১০০০ কেজি । বিজ্ঞানীদের মতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে এ উৎপাদন ৫-১০ গুণ বাড়ানো সম্ভব ।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্যের উপাদানসমূহ

মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন অনেক সম্ভাবনাময় খাদ্য উপাদান আমাদের দেশে সহজেই পাওয়া যায় । এ সকল উপাদান ব্যবহারে স্বল্প মূল্যের মানসম্মত মৎস্য খাদ্য তৈরী করা যায় । দেশে সহজে পাওয়া যায় এমন উল্লেখযোগ্য খাদ্য উপাদানগুলি হলো - কচুরী পানা, ক্ষুদি পানা, কুটি পানা, টোপা পানা, মসুরীর ডালের ভূষি, সরিষার খৈল, সয়াবিন/সয়াগ্রীস, তিলের খৈল, তিসির খৈল, চিটাগুড়, চালের কুড়া, গমের ভূষি, গমের আটা, কসাইখানার বর্জ্য, রান্নাঘরের বর্জ্য, রক্তের গুড়া, ফিশ মিল, ফিশ সাইলেজ, চিংড়ি চুর্ণ, কাকড়া চুর্ণ, রেশমকীট চূর্ণ ইত্যাদি ব্যবহার ও কার্যকারীতা না জানায় উল্লেখিত অনেক খাদ্য উপাদানই আমাদের দেশে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না । অথচ এ সকল উপাদান যথেষ্ট পুষ্টি সমৃদ্ধ হওয়ায় মৎস্য খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার মাছের উৎপাদন অনেকাংশে বাড়ানো যায় । নিম্নের সারণীতে উপরোল্লিখিত খাদ্য উপাদানের প্রাপ্যতা এবং মূল্য তালিকা দেখানো হয়েছে ।

সারণী ঃ ১ প্রধান প্রধান দেশীয় খাদ্য উৎপাদন সমূহের প্রাপ্যতা ও এর মূল্য তালিকা

উপাদানের নাম	প্রধান উৎস	প্রাপ্যতা	মূল্য (টাকা/কেজি)	
			খুচরা	পাইকারী
কচুরী পানা	জলাশয়	দেশব্যাপি	-	-
ক্ষুদি পানা	জলাশয়	,,	-	-
কুটি পানা	জলাশয় ও ধানক্ষেত	,,	-	-
টোপা পানা	জলাশয়	,,	-	-
মসুরীর ভূষি	মসুরী ডাল	চাষযোগ্য এলাকা	-	-
সরিষার খৈল	তৈলের কারখানা	দেশব্যাপি	৪.৫	৪.০
সয়াবিন/সয়াগ্রীস	সয়াবিন চাষকৃত এলাকা	ফরিদপুর,নোয়াখালী	১০.০	৯.০
তিলের খৈল	তৈলের কারখানা	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে	৬.০	৫.৫
তিসির খৈল	চাষকৃত/চাষযোগ্য এলাকা	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে	-	-
চিটাগুড়	চিনিকল	-	-	-
চালের কুড়া	চালের কলের উপজাত দ্রব্য	দেশব্যাপি	২-৬.০	-
	আটা মিল			
গমের ভূষি	আটা মিল	,,	৫.০	-
গমের আটা	কসাইখানা	,,	১২.০	-
কসাইখানার বর্জ্য	হোটেল, রেষ্টুরেন্ট	,,	৮.০	-
রান্নাঘরের বর্জ্য	কসাইখানা	,,	-	-
রক্তের গুড়া	BFDC কারখানা	,,	-	-
ফিশ মিল (A_1 গ্রেড)		চট্রগ্রাম	৩৫.০	-
ফিশ মিল (A_2 গ্রেড)	BFDC কারখানা	কক্সবাজার		
ফিশ মিল (B গ্রেড)		খুলনা	৩০.০	-
ফিশ সাইলেজ	BFDC কারখানা			
চিংড়ি চূর্ণ	ট্রাসফিশ		২৫.০	-
	চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ	উপকূলীয় জেলাসমূহ	-	-
কাকড়া চূর্ণ	কারখানা	চট্রগ্রাম,খুলনা, কক্সবাজার,	-	-
রেশমকীট চূর্ণ	উপকূলীয় জলাশয়	রবিশাল	-	-
	রেশম কারখানা	চট্রগ্রাম,খুলনা,বরিশাল		
		রাজশাহী	-	-

মাছের পুষ্টি চাহিদা

সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির পূর্বশর্ত হলো কোন মাছের পুষ্টি চাহিদা কতটুকু তা সঠিকভাবে জেনে নিয়ে সে অনুপাতে খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করা। প্রজাতি ভেদে এবং একই প্রজাতির মাছের বিভিন্ন জীবন স্তরে পুষ্টি চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের জন্য মাছের খাদ্যে আমিষ জাতীয় বিশেষ করে প্রাণিজ আমিষের উপাদানের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মাছের (বড় মাছ) খাদ্যে আমিষের চাহিদা প্রজাতি ভেদে সাধারণত: ৩৫-৪০% এর মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদন পেতে হলে রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের সুষম সম্পূরক খাদ্যে কমপক্ষে ৩৫% আমিষ থাকা বাঞ্ছনীয়। রুই জাতীয় ব্রুড মাছের আমিষের চাহিদা ৩৫-৪৫% এর মধ্যে হয়ে থাকে। তবে যেহেতু পুকুরে কিছু প্রাকৃতিক খাদ্য থাকে এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদানের মূল্য খুব বেশী, সেহেতু রুই জাতীয় মাছের স্বল্প মূল্যের

সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরিতে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী মিশ্র চাষের খাদ্যে ২০-৩০% এবং ব্রুড মাছের ক্ষেত্রে ২৫-৩২% আমিষ রাখা যেতে পারে ।

মাছের খাদ্য তৈরির প্রণালী

খাদ্যের সূত্র তৈরির প্রথমে মাছের পুষ্টি চাহিদা ও খাদ্যাভাস অনুযায়ী কম মূল্যের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য উপাদান এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে চাষকৃত মাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং দামও কম হয় । সুষম খাদ্য তৈরির জন্য খাদ্যের সাথে সাধারণত ০.৫-১% ভিটামিন ও খণিজ মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয় । তৈরিকৃত খাদ্য পানিতে বেশীক্ষণ স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসেবে আটা অথবা ময়দা ব্যবহার করতে হয় । দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাছ চাষীদের সংগতির কথা বিবেচনায় রেখে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট কর্তৃক উদ্ভাবিত রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ এবং ব্রুড মাছ চাষের স্বল্প মূল্যের উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্যের সূত্র নিম্নে দেয়া হলো ।

সারণী ঃ ২ রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের স্বল্প মূল্যের খাদ্য তৈরির সূত্র

উপাদানের নাম	আমিষের পরিমাণ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিশমিল/ব্লাডমিল	৫৬/৬৩	১২	৭
সরিষা/তিলের খৈল	৩০/২৭	৩১	৯
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	১২/১৫	৫০	৬
আটা	১৮	৫	১
ভিটামিন	-	১	-
খণিজ মিশ্রণ	-	১	-
		১০০	২৩

প্রতি কেজি মিশ্র চাষের খাদ্যের মূল্য প্রায় ১২ (বার) টাকা
খাদ্য রুপান্তর হার = ২

সারণী ঃ ৩ রুই জাতীয় ব্রুড মাছের চাষের খাদ্য তৈরির সূত্র

মাছের প্রজনন সফলতা পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করে । খাদ্যে পুষ্টির অভাব থাকলে সহজে ব্রুড মাছের পরিপক্কতা আসেনা । তাই রুই জাতীয় ব্রুড মাছের পুষ্টি চাহিদার বিষয় বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত উপাদান ব্যবহার করে উন্নতমানের খাদ্য তৈরি করা যায় ।

উপাদানের নাম	আমিষের পরিমাণ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিশমিল/ব্লাডমিল	৫৬	২৭	১৫
সরিষার খৈল	৩০	১৩	৪
তিলের খৈল	২৭	২০	৫
চালের কুঁড়া	১২	১৩	২
গমের ভূষি	১৫	২০	৩
আটা	১৮	৬	১
ভিটামিন ও খণিজ মিশ্রণ	-	১	-
		১০০	৩০

প্রতি কেজি ব্রুড মাছের খাদ্যের মূল্য প্রায় ১৫ টাকা

খাদ্য তৈরিতে অধিক মূল্যের ফিশমিলের পরিবর্তে রেশমকীট, ব্লাডমিল, চিংড়ি গুড়া, কাঁকড়া চূর্ণ এবং মুরগী ও গুরু ছাগলের নাড়িভূড়িও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাণিজ আমিষের পরিবর্তে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ যেমন ক্ষুদিপানা, কুটিপানা ইত্যাদি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের খাদ্য তৈরি করা যায় কিন্তু খাদ্যের দাম কিছুটা বেশী হলেও মাছের খাদ্যে কিছু পরিমাণ প্রাণিজ আমিষ না রাখলে আশানুরুপ উৎপাদন পাওয়া যায় না।

খাদ্য প্রয়োগ হার ও পদ্ধতি

খাদ্য ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়ার জন্য চাষকৃত মাছের খাদ্যাভ্যাস বা আচরণ জেনে নিতে হবে। চিংড়ি নৈশভোজী বলে এদেরকে সন্ধায় বা রাতে খাবার দিতে হয়। রুই জাতীয় মাছকে সকাল-বিকাল খাবার দিতে হয়। দুপুরে রোদের তাপে পানি গরম থাকে বিধায় মাছ খেতে চায়না। দৈনিক খাদ্য প্রয়োগমাত্রা প্রধানত: ৩টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন : মাছের আকার ও প্রকারভেদ এবং ঘনত্ব, খাদ্যের গুণাগুণ ও পানির তাপমাত্রা। ভেজা বা আদ্র খাদ্য পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট দৈহিক ওজনের শতকরা ৬-১০ ভাগ এবং শুকনা দানাদার খাদ্য ২-৩ ভাগ হারে দৈনিক ২ বার খাওয়াতে হয়। পোনা মাছের বেলায় একই হারে দিনে ৪/৫ বার খাবার দেওয়া ভাল। মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়।

শুকনা দানাদার খাদ্য বা পিলেট দিনে ২ বার নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরে পানির উপরিভাগে ছড়িয়ে দিতে হয়। ভেজা বা আদ্র খাবার পুকুরের চার কোণে বাশের খুটি পুঁতে পানির ১.৫-২.০ ফুট নিচে মাচা করে মাটির সানকি ভর্তি খাদ্য তাতে বেঁধে রাখা যায়। প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাবার প্রয়োগ করলে মাছ ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এতে খাদ্যের অপচয় কম হয়।

নিচের সারণীতে সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সরবরাহের প্রয়োগ হার ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

খাদ্যের প্রকার	প্রয়োগ হার	প্রয়োগের সময়	প্রয়োগ পদ্ধতি
রুড মাছের খাদ্য পিলেট খাদ্য	মাছের মোট ওজনের ২-৩%	দৈনিক ১ বার সকাল বেলা (৯.০০ ঘটিকা)	পুকুরের চার পাড়ে ৪-৬ টি নির্দিষ্ট জায়গায় মাচায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
ভেজা/আদ্র (গোল্লা খাবার)	মাছের মোট ওজনের ৩-৬%	দৈনিক ১ বার সকাল বেলা (৯.০০ ঘটিকা)	পুকুরের চার পাড়ে ৪-৬টি নির্দিষ্ট জায়গায় পানির ১-২ ফুট নীচে।
মিশ্র চাষের খাদ্য পিলেট খাদ্য	মাছের মোট ওজনের ২-৬%	দৈনিক ১-২ বার সকাল বেলা (৮-৯ ঘটিকা) বিকাল বেলা (৪-৫ ঘটিকা)	পুকুরের চার পাড়ে ৪-৬টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
ভেজা/আদ্র (গোল্লা খাবার)	মাছের মোট ওজনের ৬-৯%	দৈনিক ১-২ বার সকাল বেলা (৮-৯ ঘটিকা) বিকাল বেলা (৪-৫ ঘটিকা)	মাটির চারিতে অথবা খুটিতে আটকানো টিনের তৈরী ট্রে অথবা চাটাই ও পলিথিন দ্বারা তৈরি মাচায় রেখে প্রয়োগ করতে হবে।
মিশ্র চাষের খাদ্য	মাছের মোট ওজনের ২-৬%	দৈনিক ১-২ বার সকাল বেলা (৮-৯ ঘটিকা) বিকাল বেলা (৪-৫ ঘটিকা)	পুকুরের চার পাড়ে ৪-৬টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

ভেজা/আদ্র (গোল্লা খাবার)	মাছের মোট ওজনের ৬-৯%	দৈনিক ১-২ বার সকাল বেলা (৮-৯ ঘটিকা) বিকাল বেলা (৪-৫ ঘটিকা)	মাটির চারিতে অথবা খুটিতে আটকানো টিনের তৈরী ট্রে অথবা চাটাই ও পলিথিন দ্বারা তৈরি মাচায় রেখে প্রয়োগ করতে হবে।

মৎস্যচাষীদের জ্ঞাতব্য

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছ ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে । এতে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিৎ হয় । তাই প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাবার প্রয়োগ করা উচিত ।
- পুকুরের পানির তাপমাত্রা এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের তারতম্যের সাথে খাদ্য প্রয়োগ হারও কম-বেশী হবে ।
- শীতকালে (পৌষ-মাঘ মাস) খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়ে আনতে হয় ।
- পুকুরের পানির গভীরতা কমে গেলে এবং তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলেও উপরোক্ত হারে খাবার কমিয়ে আনা যায় । পুকুরে শেওলার স্তর পড়লে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে ।
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর অথবা মাসে একবার মাছের নমুনা সংগ্রহ করে মাছের দেহের ওজনের সাথে সংগতি রেখে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হয় ।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ভূমিকা

গোলাম মুর্তাজা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, রপ্তানী এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং এক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের ৪৮০ কিলোমিটার তটরেখা ও ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ৪৮,৩৬৫ বর্গ মাইল (নটিক্যাল) উর্বরা সমুদ্র এলাকা রয়েছে। এ জল সীমায় আহরণ যোগ্য ২১ প্রজাতির চিংড়ি ও ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে।

১৯৭০-৭২ সালে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ছিল ৮.১৪ লক্ষ টন যা হ্রাস পেয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ৬.৪৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে দেশের মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১০.৮৭ টনে পৌছে, যার মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমান ছিল প্রায় ২.৫০ লক্ষ টন। স্বাধীনতার পর থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ৮৫ হাজার টন থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে প্রায় ২.৬০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে যার বৃদ্ধির হার ৩০০% এরও বেশী। দেশে বর্তমানে মাছের উৎপাদন মোট ১.১ মিলিয়ন টন। এ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম। চাহিদা অনুযায়ী মাথা পিছু প্রতি দিন মাছের প্রয়োজন ৩৮.০০ গ্রাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্তমান উৎপাদনে সরবরাহের পরিমান দৈনিক ২০-২৫ গ্রাম মাত্র।

বিগত ১৯৬৪ইং সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কপোরেশেন সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ও গবেষণা, মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নিমিত্তে ট্রলার বহরের প্রচলন, দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণ, উন্নত মানের যান্ত্রিক নৌকা প্রচলন, সর্বপ্রকার আধুনিক মৎস্য জাল উৎপাদন, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন, বরফকল স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক ও স্বাস্থ্য সম্মত মৎস্য বন্দর, মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, রাঙ্গামাটি হ্রদের মৎস্য ব্যবস্থা, বিপনন ও বিতরণ, জনশক্তি উন্নয়ন কল্পে মেরিন ফিশারিজ একাডেমী স্থাপন ইত্যাদি অবকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কাজ কর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৯৬৪ইং সন হতে ১৯৮৮ইং সন এর জুন মাস পর্যন্ত এ কর্পোরেশন মূলতঃ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে দেশের মৎস্য শিল্পের ক্ষেত্রে মজবুত বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এ সময়ে কর্পোরেশন মূলতঃ সেবা/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কিছু কিছু আধা বাণিজ্যিক, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

১৯৮৯ইং সাল হতে কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে সেবা/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিধি কমিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে জোরদারকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে জোরদারকরণের লক্ষ্যে কাপ্তাই, ডিএনডি ও গুলশান লেক সমূহে পোনা অবমুক্তি বৃদ্ধি, ২টি সাদা মাছ ধরার ট্রলারকে চিংড়ি ট্রলারে রূপান্তর এবং চট্রগ্রাম মৎস্য বন্দরে দ্বিতীয় স্লিপওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি করায় কর্পোরেশন সামগ্রিক ভাবে ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ সালে যথাক্রমে ২২৭.৪৭ লক্ষ, ৪৫.৩৫ লক্ষ এবং ৮৬.৮৬ লক্ষ টাকা অপারেশনাল লাভ করতে সক্ষম হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কেবল ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক সালে কর্পোরেশন ৬.১০ লক্ষ টাকা নীট লাভ করতে সক্ষম হয়। আরো উল্লেখ্য যে, সাদা মাছ ধরা ২টি ট্রলারকে চিংড়ি ট্রলারে রূপান্তরকণের সুফল হিসেবে ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ইং সনে কর্পোরেশনের ট্রলার বহর ইউনিট যথাক্রমে ১৫৭.৬৭ লক্ষ, ১৩৬.০৩ লক্ষ এবং ১১০.৬৫ লক্ষ টাকার হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা

অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে ১৮টি বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে। কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালিত রাজস্ব ইউনিটগুলো পরিচালনার জন্য কোন সরকারী অনুদান/ ঋণ গ্রহণ করা হয়নি। কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব তহবিল দ্বারাই ইউনিটগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ইং সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরিপ, মৎস্য শিকার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সুষ্ঠু মৎস্য আহরণ, মৎস্য অবতরণ, মৎস্য অবকাঠামো নির্মাণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানী সংক্রান্ত কাজে যে সকল ভূমিকা পালন করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলঃ-

ক. মৎস্য সম্পদের জরিপ

১৯৬৬ইং হতে ১৯৭২ইং পর্যন্ত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রাক-পুঁজি বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে সাগর সন্ধানী ও মীন সন্ধানী নামক গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের উপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কার্য পরিচালনা করে এবং ফলশ্রুতিতে ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিস্কার করে।

উক্ত জরিপের ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রতি বছর ২.৬৪ লক্ষ - ৩.৭৩ লক্ষ টন বিভিন্ন প্রজাতির সাদা মাছ এবং ৪০০০ - ৪৫৯৯ টন সামুদ্রিক চিংড়ি আহরণ সম্ভব বলে চিহ্নিত করা হয়। এ ছাড়া সামুদ্রিক চিংড়ির স্টান্ডিং স্টক ৯০০০ টন বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আরো কয়েকটি গবেষণা জাহাজ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করে যার ফলাফল পূর্বের ন্যায় বলে মত প্রকাশ করা হয়।

খ. দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণ

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ষাটের দশকে। ১৯৬৪-১৯৬৮ইং সনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সুইডিশ ফ্রিডম ফর হাঙ্গার ক্যাম্পেইন প্রকল্পের অধীনে ৬-১২ অশ্বশক্তি সম্পন্ন আউট বোর্ড কেরোসিন ইঞ্জিন দ্বরা ২৮৫টি দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বৈদেশিক সহায়তায় মোট ১০৪০ টি মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন এবং ১৩০০ টি যান্ত্রিক নৌকা কিস্তিতে/নগদে জেলেদের মধ্যে বিতরণ করে।

গ. গভীর সমুদ্রে ট্রলার ফ্লীটের প্রবর্তন

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ জরীপের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ও চিংড়ি মজুদের তথ্য প্রকাশিত হলে ট্রলিং শিল্পে বিনিয়োগের উৎসাহ দেখা দেয়।

রাশিয়ান প্রযুক্তি সহায়তায় সরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সর্ব প্রথম ১৯৭২ইং সালে রাশিয়া থেকে অনুদানে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকারের ১০টি ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ আরম্ভ করে। পরবর্তীতে বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ ও গভীর সমুদ্রে ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হয়। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ৫৩টি ট্রলার (৪১টি চিংড়ি ও ১২টি সাদা মাছ) ৪০ মিটার থেকে ৮০ মিটার গভীর মহীসোপান অঞ্চলে চিংড়ি ও মাছ আহরণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ থেকে বার্ষিক ৩,৫০০ - ৬,০০০ মেট্রিক টন চিংড়ি ও ৮,০০০ - ১২,০০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির সাদা মাছ অবতরণ করা হয়ে থাকে।

সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন চিংড়ি ট্রলার ও সাদা মাছের ট্রলারের সংখ্যা ও বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান নিম্নে টেবিল-১ ও টেবিল-২ এ দেয়া হলঃ-

টেবিল-১ ঃ ট্রলার সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক	বৎসর	সাদা মাছের ট্রলারের সংখ্যা	চিংড়ি ট্রলারের সংখ্যা
১	১৯৯০-৯১	১২টি	৪২টি
২	১৯৯১-৯২	১৪টি	৪৬টি
৩	১৯৯২-৯৩	১২টি	৩৭টি
৪	১৯৯৩-৯৪	১১টি	৪০টি
৫	১৯৯৪-৯৫	১১টি	৪০টি
৬	১৯৯৫-৯৬	১২টি	৪১টি
৭	১৯৯৬-৯৭	১২টি	৪১টি

ঘ. প্রশিক্ষণ সুবিধা স্থাপন

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন রাশিয়ার সহায়তায় ১৯৭৩ইং সালে "ফিশারিজ ট্রেনিং সেন্টার" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য শিল্পে দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি তৈরীর নিমিত্তে মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রামে মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, নেভিগেশন, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রল অপারেশন, ফিশ প্রসেসিং, গিয়ার টেকনোলজি, রেডিও ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা হত। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পাশ করা ক্যাডেটগণ দেশী ও বিদেশী ট্রলার ও গভীর সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত রয়েছে।

বর্তমানে উক্ত একাডেমী সরাসরি মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। উক্ত একাডেমীতে অদ্যাবধি ১০০০ এর ও বেশী ক্যাডেট প্রশিক্ষণ লাভ করেছে এবং বিদেশে চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে মেরিজ ফিশারিজ একাডেমীতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, নেভিগেশন এবং ফিশ প্রসেসিং কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

ঙ. মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন

মৎস্য শিল্পের উন্নতি কল্পে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন অত্যাধুনিক সুবিধাদি সম্পন্ন একটি মৎস্য বন্দর জাপানী সহায়তায় ৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামে নির্মাণ করে। মৎস্য বন্দরে সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬৮টি মাছ ধরার ট্রলার বার্থিং করার এবং উক্ত ট্রলার কর্তৃক ধৃত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুবিধাদি রয়েছে।

সমুদ্র উপকূলীয় যান্ত্রিক নৌকা সমূহ কর্তৃক ধৃত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কক্সবাজার, খুলনা, খেপুপাড়া, পাথরঘাটা, বরিশাল এবং সর্বশেষে মনোহরখালীতে অত্যাধুনিক সুবিধাদি সম্পন্ন মৎস্য অবতরণ ঘাটি, বরফ কল, হিমাগার ইত্যাদি জাপান ও ডেনমার্কের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণ করেছে।

টেবিল-২

মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের বছরওয়ারী তথ্য

উৎপাদনঃ লক্ষ টনে

বৎসর	অভ্যন্তরীণ আহরণ (টন)	মৎস্য চাষ (টন)	সামুদ্রিক মৎস্য (টন)	মোট মৎস্য উৎপাদন (টন)
১৯৯০-৯১	৪.৪৩	২.১১	২.৪২	৮.৯৬
১৯৯১-৯২	৪.৭৯	২.২৭	২.৪২	৯.৪৮
১৯৯২-৯৩	৫.৩৩	২.৩৮	২.৫০	১০.২১
১৯৯৩-৯৪	৫.৫২	২.৭৫	২.৬০	১০.৮৭
১৯৯৪-৯৫	৫.৭০	৩.৩০	২.৭০	১১.৭০
১৯৯৫-৯৬	৫.৯৫	৩.৯০	২.৭৯	১২.৬৪

বর্তমানে অত্র কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন আকারের ৩টি চিংড়ি ট্রলার, ৫টি সাদা মাছের ট্রলার ও ১টি পরিবহন জাহাজ রয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ট্রলার বহর কর্তৃক ধৃত চিংড়ি ও রপ্তানী আয়ের গত ৫ বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব টেবিল-৩এ দেয়া হল ঃ

টেবিল-৩

ট্রলার বহর কর্তৃক ধৃত চিংড়ি ও রপ্তানী বাবদ আয়

মূল্য ঃ লক্ষ টাকায়/ডলার পরিমাণ টনে

ক্রমিক নং	আর্থিক বৎসর	চিংড়ির পরিমান (টন)	রপ্তানী বাবদ আয় (টাকা)
১	১৯৯২-৯৩	৪৯.৪৮	১১৫.৬৬
২	১৯৯৩-৯৪	৪৮.৮১	১৫৭.৬৭
৩	১৯৯৪-৯৫	৩৯.৫১	১৩৬.০২
৪	১৯৯৫-৯৬	৩৯.৪৮	১১০.৬৫
৫	১৯৯৬-৯৭	৬৪.৫২	১৯০.৬৮

চ. মৎস্য জাল কারখানা নির্মাণ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ট্রলার বহর, যান্ত্রিক নৌকা, দেশীয় নৌকা ইত্যাদিতে উন্নত মানের জাল সরবরাহের নিমিত্তে বিভিন্ন কাউন্টের ও সাইজের জাল বুনন ক্ষমতা সম্পন্ন কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও মংলায় ৩টি মৎস্য জাল কারখানা স্থাপন করে। উক্ত ৩টি কারখানায় বাৎসরিক ৪.২০ লক্ষ পাউন্ড জাল বুনন করা সম্ভব।

ছ. চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী

বাংলাদেশর কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময়। জাতীয় উৎপাদনের ৪.৭% এবং কৃষি সম্পদ হতে আয়ের প্রায় ১৪% এ খাতের অবদান। রপ্তানী আয়ে ১০% অর্জিত হচ্ছে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে।

হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান এবং উক্ত মালামাল রপ্তানী করে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব টেবিল-৪ এ এবং দেশের সামগ্রিক হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানীর ৫ বছর অন্তর হিসাবের তুলনামূলক বিবরণী ও প্রবৃদ্ধির হার টেবিল-৫ এ দেয়া হলঃ

টেবিল-৪

বিগত কয়েক বছরের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর পরিমান ও আয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	বৎসর	হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিমান (মেট্রিক টনে)	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমান (কোটি টাকায়)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার
১	১৯৯০-৯১	২৬১০৯	৫২৬.৬২	৭.৯৬%
২	১৯৯১-৯২	২২০৮০	৫২৪.৩৫	(-)০.৪৩%
৩	১৯৯২-৯৩	২৬৬০৭	৭০০.২৯	৩৩.৫৫%
৪	১৯৯৩-৯৪	৩১৮৩৫	৯২০.৯৬	৩১.৫১%
৫	১৯৯৪-৯৫	৪০৪১৯	১২৮৫.৭০	৩৯.৬০
৬	১৯৯৫-৯৬	৩৮৯২৯	১৩৪০.৯০	৪.২৯%

উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

টেবিল-৫

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর ৫ বছর অন্তর আয়ের হিসাব ও প্রবৃদ্ধির হার

আয় মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক নং	বৎসর	হিমায়িত খাদ্য খাতে আয় ইউ,এস,ডলার	মোট রপ্তানীর শতকরা %হার	প্রবৃদ্ধির হার
১।	১৯৮৫-৮৬	১১৩.২০	১৩.৮২%	-
২।	১৯৯০-৯১	১৪১.৮০	৮.২৬%	২৫.২৬%
৩।	১৯৯৫-৯৬	৩১৩.৭০	৮.০৮%	১২১.২২%

উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

১৯৮৯ সাল থেকে কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিধি কমিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে ১৮(আঠার) টি বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে এবং এর অধীনে পরিচালিত রাজস্ব ইউনিটগুলো পরিচালনার জন্য কোন সরকারী অনুদান বা ঋণ নেয়া হয়নি। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠ অবতরণ, বাজারজাতকরণ এবং প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণের জন্য কক্সবাজার এবং পাথরঘাটাস্থ প্রকল্প দু'টিতে অধিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য ৮.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যেই আরম্ভ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বৎসরের তূলনায় বর্তমানে সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি আহরণের পরিমান আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের চিহ্নিত ফিশিং গ্রাউন্ড এ বর্তমানে মাছ আশানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না। এর সম্ভাব্য কারণ হলো, বঙ্গোপসাগরে ট্রলার বহর ও যান্ত্রিক নৌকার অবৈধ অনুপ্রবেশ ও যত্রতত্র মৎস্য নিধন। বর্তমান মৎস্য শিকার ক্ষেত্রগুলো প্রায় ২৫-৩০ বছর পূর্বে আবিস্কৃত। এসব ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য শিকার চলছে। এমতাবস্থায়, নতুনভাবে মৎস্য শিকারের স্থান চিহ্নিত করবার জন্য বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা আবশ্যক। এ কার্যক্রমে দেশী সংস্থার সঙ্গে জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগিতা নেয়া গেলে কর্পোরেশন নতুন মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেশের সার্বিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এছাড়া বঙ্গোপসাগরের মৎস্যের বাৎসরিক আহরণ ক্ষমতার বাইরে যেন অধিক ট্রলার নিয়োজিত না করা হয় সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। তদুপরি বৈদেশিক ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে বিগত বছরের তূলনায় মৎস্য অবতরণ ব লাংশে হ্রাস পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অননুমোদিত ভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেসরকারী ভাবে যত্রতত্র মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপন করা। ফলে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে আনুমানিক শতকরা ৪০% মাছ অবতরণ করা হয় না। এতে কর্পোরেশন বিপুল পরিমান রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯৯৩ সনে জারীকৃত মৎস্য অবতরণ সংক্রান্ত আইন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ না করার ফলে কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মাছ অবতরণে জেলেদেরকে বাধ্য করতে পারছে না। সাম্প্রতিক কালে ই.ইউ মিশনের চাহিদা অনুযায়ী মৎস্য আহরণের পর হতেই যথাযথ ভাবে হ্যাসাপ বিধিমালা অনুস্মরণ না করলে বাংলাদেশের মৎস্য বিদেশে রপ্তানীর দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে দেশ বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীণ হবে যা মোটেই কাম্য নয়। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে সকলেরই আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের ট্রলিং শিল্প ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোঃ মাসুদুর রহমান
পরিচালক (সামুদ্রিক)
মোঃ মাহমুদুল হক
সহকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর

উপক্রমনিকা

১৯৫৮ সন থেকে সময় পর্যন্ত (প্রথমত তদানিন্তন পাকিস্তান ও পরে) বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের চারণক্ষেত্র, বিস্তৃত, প্রাচুর্য, প্রজননকাল ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের বার্ষিক আহরণযোগ্য পরিমাণ কিংবা মজুদ সম্পর্কে মত পার্থক্য অধিক থাকার কারণে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো না গেলেও চিংড়ির মজুদ সম্পর্কে একটি জোড়ালো ইংগিত পাওয়া যায় এবং বঙ্গোপসাগরের ১২ টির অধিক মৎস্য চারণক্ষেত্র চিহ্নিত হয় যাতে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।

সত্তর দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন তদানিন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত ১০ টি ট্রলারের একটি বহরের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য সম্পদ আহরণ কর্মকান্ড শুরু করে।

বিভিন্ন জরিপ ফলাফলে প্রাপ্ত মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যের ইংগিত এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ কর্মকান্ডের লাভজনক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীগণ এক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয় এবং সত্তর দশকের শেষদিকে ও আশির দশকের প্রথম দিকে ব্যক্তিমালিকানায় বিনিয়োগকারীগণ বেশ কিছু সংখ্যক ট্রলার (মূলতঃ তিনটি ব্যবস্থাধীনে , যেমন-১. যৌথ উদ্যোগ,২. আয় থেকে দায় পরিশোধ ও ৩. বাংলাদেশী মালিকানা) বাংলাদেশে আমদানি করে।

আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয় '**ওপেন জেনারেল লাইসেন্স** (ওজিএল)' এর মাধ্যমে ট্রলার আমদানির অনুমতি প্রদান করে এবং এ প্রক্রিয়ায় ১৯৮৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১১৪ টি ট্রলার সংগৃহিত হয়।

ইতোমধ্যে ১৯৯৮৩ সনের জুলাই মাসের " **দি মেরিন ফিশারীজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩** " এবং তদাধীনে ১৯৮৩ সনে সেপ্টেম্বর মাসে " **দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩** " জারী হয়। ১৯৮৩ সনে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং- ৩৫.১৯৮৩) জারী করা হলেও নানাবিধ কারণে এর বিধানসমূহের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে ট্রলার সমূহের ব্যাপক ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে, বিশেষ করে চিংড়ির উচ্চ রপ্তানি মূল্যের কারণে প্রায় সকল ট্রলারই সাধ্যানুযায়ী চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত থাকে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় চিংড়ি সম্পদের ওপর চাষসহ স্বাভাবিক নবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রিপরিষদ এর ১৩-০১-১৯৮৫ তারিখের সভায় ট্রলিং শিল্প নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ক্ষতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তমধ্যে ৩ টি সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ ক. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মেরিন ফিসারীজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ নিরীক্ষা করে এর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ণ করা হবে। খ. দেশীয় উদ্যোগী সংস্থাগুলিকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য যৌথ উদ্যোগে বা পে এজ ইউ আর্ন ভিত্তিতে আর কোন জাহাজ আমদানি না করা। গ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে মজুদ নির্ণয় না করে আর কোন মৎস্য জাহাজের ব্যবহার বন্ধ করা।

উপরোক্ত ক. সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত প্রতিবেদন মতে ৩১-১২-১৯৮৪ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১১৪ টি ট্রলার আমদানি করা হলেও ঐ সময়ের মধ্যে ২৩ টি ট্রলার পালিয়ে/ডুবে যাওয়া তখন বাংলাদেশে মোট ৯১ টি ট্রলারের অবস্থান ছিল, যার মধ্যে মাত্র ৭৩ টি ট্রলার প্রকৃতপক্ষে সম্পদ আহরণে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তীতে মন্ত্রী পরিষদ সভায় বাংলাদেশে ট্রলার বহরের পরিধি ৭৩ টি সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে ধারণা করা হয়।

ট্রলার বহরের বর্তমান পরিধি

০১-০৮-১৯৯৭ তারিখের অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রলার বহরের পরিধি নিম্নরূপ ঃ

অবস্থান	চিংড়ি ট্রলার	মৎস্য ট্রলার	মোট
ক. সম্পদ আহরণরত	৪১	১৩	৫৪
খ. মেরামতাধীন	৩	১	৪
গ. প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায়	১	১	২
ঘ. মৎস্য অধিদপ্তরের জরিপ জাহাজ, ব্যবহারের অপেক্ষায়	-	১	১
ঙ. ০২-০২-১৯৯৭ তারিখ নিমজ্জিত	-	১	১
চ. অনুমতিপ্রাপ্ত বহরের সংযোজন অপেক্ষায়	৪	১	৫
মোট	৪১	১৮	৬৭

তাছাড়া, উপরোক্ত তালিকা বহির্ভূত বিচারাধীন ৮ টি ট্রলার (বেঙ্গল ফিশারীজ এর ৭টি, সাগর সম্ভার এর ১ টি) বিচারাধীন, ২টি ট্রলার (সী-সাস-ডি-২, সায়রা) , সিভিল রিভিশনাধীন ১ টি ট্রলার (সুংথং) এবং প্রতিস্থাপনাদেশ বাতিলকৃত ১ টি ট্রলার (মেঘনা-০১) অর্থাৎ মোট ১২ টি ট্রলারে রয়েছে। এ গুলো ভবিষ্যতে বহরের অন্তর্ভূক্ত হলে ট্রলার বহরের পরিধি ৭৯ টিতে দাঁড়াবে ।

বর্তমান বহরের দক্ষতার ব্যবহার

ক. ট্রিপের স্থায়িত্বকাল

বর্তমান বহরের চিংড়ি ট্রলারগুলো প্রতিট্রিপে ৩০দিন এবং মৎস্য ট্রলারগুলো প্রতিট্রিপে ১৫ দিন সমুদ্রসম্পদ আহরণে নিয়োজিত থাকে। তাতে ট্রলারগুলো বছরে প্রায় ৯০০০ দিবস ট্রলিং করে গড়ে প্রায় ৪০০০ টন চিংড়ি এবং ১৬০০ টন মৎস্য অবতরণ করে থাকে।

খ. ট্রলারের ক্যাপাসিটি

বর্তমান বহরের ট্রলারগুলোর গড় ফিশহোল্ড ক্যাপাসিটি ৮৮ মেট্রিক টন। গত ১১ বছরের আহরণ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তারা তাদের ক্যাপাসিটি ৫১ ভাগ ব্যবহার করছে না বা করতে পারছে না।

গ. ট্রলারের দক্ষতা

বর্তমান বহরের ট্রলারগুলোর বিগত ১১ বছরের গড় তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি ট্রলার গড়ে ১৪৯ দিন ফিশিং নিয়োজিত থেকে ৬৫ টন চিংড়ি ও ১৬১ টন মৎস্য আহরণ করে থাকে। তাতে মাত্র ৬ টি চিংড়ি ট্রলার ও ৫ টি মৎস্য ট্রলার সর্বাধিক দক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ট্রলারসমূহের মধ্যে ১৫ টি চিংড়ি ও ৬ টি মৎস্য ট্রলার সর্বাধিক অদক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া প্রায় ২৮% ট্রলার তাদের গড় ফিশিং দিবস ব্যবহার করতে পারছে না।

উপরোক্ত ক. খ. ও গ. থেকে নিম্নরূপ বিকল্প ধারনা করা যায়

১. আহরণযোগ্য দক্ষতায় ট্রলার পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না।

২. ফিশিং দিবস কম ব্যব ত হচ্ছে বলেই ক্যাপাসিটির ব্যবহার কম হচ্ছে।

৩. সর্বাধিক দক্ষতায় ট্রলার পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না।

৪. চিংড়ি ট্রলার দীর্ঘদিন ট্রিপে থাকছে বলেই প্রথমদিকে চিংড়ি ব্যতিত অন্যান্য কমমূল্যের মাছ সমুদ্রে নিক্ষেপ।

ঘ. শ্রেণীবিন্যাস জটিলতা

বর্তমান বহরে চিংড়ি এবং মৎস্য শ্রেণীতে বিভক্ত দুধরনের ট্রলার রয়েছে। তৎমধ্যে চিংড়ি ট্রলারগুলির মধ্যে কিছু ডবল রিপার এবং কিছু ষ্টার্ন ট্রলিং সম্পন্ন । কারিগরি দূর্বলতার কারণে ষ্টার্ন ট্রলারের চিংড়ি আহরণ দক্ষতা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম। কিন্তু উভয় পদ্ধতির ট্রলার একই পরিবারভূক্ত থাকার কারণে এদের চিংড়ি আহরণসহ মৎস্য ও চিংড়ির উপাত্ত পরিবীক্ষণে জটিলতা সৃষ্টি করে।

১. চিংড়ি ট্রলার (ডবল রিগার) এর গড় আহরণ দিবস-১৫১ দিন, আহরিত চিংড়ির পরিমাণ ৮৬ টন এবং মৎস্যের পরিমাণ- ৬৯ টন।

২. চিংড়ি ট্রলার (ষ্টোর্ন) এর গড় আহরণ দিবস - ১৬৯ দিন, আহরিত চিংড়ির পরিমান ২১ টন এবং মৎস্যের পরিমান-৫১২ টন। অথচ যেহেতু উভয় পদ্ধতির ট্রলারই চিংড়ি ট্রলার হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসকৃত, তাই তাদের উপাত্ত (গড় আহরণ দিবস-১৫৪ দিন, চিংড়ি আহরণ-৮০ টন এবং মৎস্য আহরণ-১০৯ টন) পরিস্থিতির প্রতিফলনে বিঘ্ন ঘটায় এবং বিশ্লেষণ বা নীতিমালা প্রণয়ন উভয়ক্ষেত্রেই জটিলতা সৃষ্টি করে থাকে।

সম্পদের প্রাচুর্য ও আহরণ সম্ভাবনা

ক. জরিপ তথ্য

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য নির্ণয়ের জন্য ১৯৫৮ সন থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫ টি জরিপ জাহাজ দ্বারা জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপকর্মকান্ড কোন সমন্বিত প্রয়াস না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে যেসব তথ্য উপস্থাপন করেছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	ভেসেল	মজুদের গড় পরিমাণ (লক্ষ টন)	আহরণযোগ্য পরিমাণ (লক্ষ টন)
১.	সাগরসন্ধানী ও মীন সন্ধানী (ডঃ ওয়েষ্ট, ১৯৭৩)	ডিমার্সাল-৩.১২	১.৭৫
		চিংড়ি-০.০৯	০.০৯
২.	শান্তামনিকা, ওরিয়ন-৮	চিংড়ি -০.০৩৫-০.০৪	০.০৩৫-০.০৪
	(মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, ১৯৮০)		
৩.	ডঃ ফ্রিজফ নানসেন		
	(নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৭৯ এবং মে ১৯৮০)	ডিমার্সাল-১.৬০	১.০০
		পেলাজিক-০.৬০-১.২০	-
৪.	ক. ডঃ পেন ,১৯৮২	ডিমার্সাল-	০.১০-০.১৪
		চিংড়ি-০.০২-০.০৪	০.০২-০.০৪
	খ. ডঃ পেন, ১৯৮৩	চিংড়ি ০.০৪৮	০.০৪৮
৫.	অনুসন্ধানী	ডিমার্সাল-১.৮৮	০.৪৮-০.৮৯
৬.	বেঞ্জালীগঞ্জ, ১৯৮৮	চিংড়ি -	০.০৪১

পরবর্তী সময়ে, অক্টোবর, ১৯৮৯ তে প্রকাশিত অনুসন্ধানীর জরিপ ফলাফলে দেখা যায় যে, সর্ব্বোচ্চ আহরণযোগ্য চিংড়ির পরিমাণ (এম এস ওয়াই) ৩,৭০০ টন। তাছাড়া, টাইগার এবং ব্রাউণ চিংড়ি বেশিআহরণ হচ্ছে।

খ. বাণিজ্যিক আহরণ তথ্য

বিগত ১২ বছরের (১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯৪-৯৫) সমুদ্র সম্পদের আহরণ/অবতরণ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বছরে গড়ে প্রায় ২২৮ হাজার টন সম্পদ আহরিত হয়। তৎমধ্যে চিংড়ির পরিমাণ ১৫ হাজার টন এবং মাছের পরিমাণ ২১৩ হাজার টন। আহরিত চিংড়ির মধ্যে প্রায় ৩৭০০ টন চিংড়ি ট্রলার দ্বারা এবং অবশিষ্ট চিংড়ি আর্টিশন্যাল ভেসেলে আহরিত হয়েছে।

গ. ট্রলার দ্বারা আহরিত চিংড়ির প্রজাতি ভিত্তিক অবস্থা

বিগত ১৫ বছরে আহরিত চিংড়ির প্রজাতিভিত্তিক তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টাইগার চিংড়ি এবং ব্রাউন চিংড়ি এর উপর অত্যাধিক আহরণজনিত চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অন্যান্য দেশের ট্রলিং শিল্প

নরওয়ে, স্পেন, ভারত, পাকিস্তান, বৃটেন, জাপান- এসব দেশ সমুদ্র সম্পদ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে তারা ট্রলারকে স্ক্র্যাপ করছে, সংখ্যা কমাচ্ছে, চিংড়ি/টুনা আহরণ আহরণ বন্ধ করছে, ঋণের সুদের হার বাড়াচ্ছে। এসবই করা হচ্ছে সম্পদ সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য।

তথ্য পর্যালোচনা

উপরোক্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হচ্ছে তা হল ঃ

ক. সমুদ্র সম্পদ সম্পর্কিত সর্বশেষ জরিপ তথ্যের অপ্রাপ্যতা। পুরনো এবং বিচ্ছিন্ন জরিপ তথ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হচ্ছে। তথাপিও বলা যায়, জরিপ তথ্য এবং বাণিজ্যিক আহরণ তথ্যের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে।

খ. জরিপ ফলাফলের সীমার চেয়ে পরিমাণ সমুদ্র সম্পদ আহরিত হচ্ছে।

গ. বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির চিংড়ির উপর আহরণজনিত অধিক চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঘ. ট্রলারের শ্রেণী বিন্যাস জটিলতা ট্রলার বহরের কর্মকান্ড পরিবীক্ষণে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ঙ. চিংড়ি ট্রলারের ট্রিপের স্থায়িত্বকাল অধিক হওয়ার কারণে তারা কম মূল্যমানের সাদা মাছ সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

চ. বর্তমান বহরের দক্ষতা পূর্ণতা পেলে শুধু চিংড়ি নয়-মাছের উপরও আহরণজনিত অধিক চাপ সৃষ্টি করবে।

ছ. বিচারাধীন/বিবেচনাধীন ট্রলারগুলো বহরে অন্তর্ভূক্ত হলে আহরণজনিত চাপ বাড়বে বই কমবে না।

জ. বর্হিবিশ্বেও সমুদ্রসম্পদ নিয়ে উদ্দিগ্ন এবং এর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সংরক্ষণশীল মনোভাব পোষন করছে।

উত্থাপিত বিষয়গুলো থেকে বাংলাদেশের ট্রলিং শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সহজ হবে বলে দৃঢ়মত পোষণ করা যায়।

প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক(অভ্যন্তরীণ মৎস্য)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দীঘি, আর মৌসুমী জলাশয় সমৃদ্ধ আমাদের এ দেশ। এ দেশে কৃষিজ জমির তুলনায় জলাশয়ের পরিমাণ বেশি। ফলে আবহমান কাল থেকে এ দেশ মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের নিত্যদিনের আমিষের চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগই সরবরাহ হয় মাছ থেকে। জাতীয় আয়ের ৪.৭০% এবং রপ্তানি আয়ের ১০% অর্জিত হচ্ছে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মৎস্য সেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে মৎস্য সেক্টরে প্রায় ১২.৭৬ লক্ষ সার্বক্ষণিক মৎস্যজীবী রয়েছে। এ ছাড়া এ পেশার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক জড়িত।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের প্রধান তিনটি উৎসের মোট আয়তন হল ২০৯.১৫ লক্ষ হেক্টর। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ হেঃ। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ২.৬১ লক্ষ হেঃ এবং ১৬৬.০৭ লক্ষ হেঃ সামুদ্রিক এলাকা। এর মধ্যে প্লাবনভূমির পরিমাণ ২৮.৩৩ লক্ষ হেঃ। অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ৬৬% প্লাবন ভূমি। এ প্লাবনভূমিতে সাধারণত বর্ষা মৌসুমে ৩ থেকে ৬ মাস পানি থাকে। প্লাবন ভূমির সিংহ ভাগ বছরে বেশিরভাগ সময় শুষ্ক থাকায় এখানে ধান সহ বিভিন্ন কৃষি ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্লাবন ভূমিতে কৃষি কাজে সার ব্যবহার ও পলিমাটি জমে বিধায় মৎস্য উৎপাদনের জন্য দরকারী মৌলিক উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তাই এখানকার মাটি ও পানির উর্বরতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হওয়ায় এবং পানির গভীরতা উপযুক্ত পর্যায়ে থাকায় প্লাবনভূমি নানাবিধ প্রজাতির মাছের উৎকৃষ্ট চারণভূমি ও উপযুক্ত আবাসস্থল। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই এ দেশের মাছের প্রায় সকল প্রজাতির প্রজনন কাল। এ প্লাবনভূমি অধিকাংশ মাছের প্রজনন স্থল। ফলে সকল প্রজাতির মাছের নতুন প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে প্লাবনভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষাট ও সত্তর দশকে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মোট উৎপাদনের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যেত প্লাবনভূমি থেকে। ফলে দেশের বিরাট একটি অংশের মৎস্যজীবীগণ প্লাবনভূমিতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার কারণে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের চিন্তা না করে মাত্রাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য আহরণ করা হয়েছে। প্লাবনভূমিতে বিচরণরত পোনা মাছ নিধনসহ নানাবিধ মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে প্লাবনভূমির মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। প্লাবনভূমিতে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

প্লাবনভূমিতে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণসমূহ

ক. অতি আহরণ

বিগত পঞ্চাশ দশকে এ দেশে যে জনসংখ্যা ছিল তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মাছের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য প্লাবনভূমিতে অতি আহরণজনিত সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠী নির্বিচারে মাছের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র প্লাবন ভূমির পোনা মাছ নিধন, ডিমওয়ালা মাছ আহরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রের ডিম পোনা পর্যন্ত নিধন করছে।

খ. কীটনাশক ব্যবহার

প্লাবন ভূমিতে ধান চাষের জন্য ব্যাপকভাবে কীটনাশক ব্যবহার হয়ে আসছে। এই কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

গ. বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের ভিতরে মাছের স্বাভাবিক বিচরণ, প্রজনন ও শুষ্ক মৌসুমে প্লাবনভূমি থেকে পেরিনিয়াল মুক্ত জলাশয়ে মাছের যাতায়াত বাধাগ্রস্থ হয়ে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। ফলে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

ঘ. পানি দূষণ

কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ শোধন না করে সরাসরি বা মুক্ত জলাশয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, ফলে বর্জ্য পদার্থের বিষক্রিয়ায় অনেক মাছ মারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ছাতক সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত পেপার মিলের বর্জ্য পদার্থের বিষক্রিয়ার কথা ঐ এলাকায় সুবেদিত।

ঙ. পলি দ্বারা ভরাট

নদীর উৎপত্তিস্থলগুলোতে গাছপালা নিধনসহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের ফলে নদীতে বহমান পলির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অসংখ্য হাওড়, বিল, প্লাবনভূমির গভীরতা হ্রাস পেয়ে ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত হয়েছে।

চ. কারেন্ট জালের ব্যবহার

মনো ফিলামেন্ট সুতা দ্বারা নির্মিত কারেন্ট জাল মৎস্য উৎপাদনে এক বিরাট অন্তরায়। যদি প্লাবন ভূমিতে বছরে নূনতম ৩ (তিন) মাস জাল ব্যবহার করা বন্ধ করা যেত তাহলে মাছের এত আকাল হতো না।

ছ. মৎস্য আইন

মৎস্য আইন প্রয়োগ একটি জটিল কাজ। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ও মৎস্য অধিদপ্তর জড়িত। এ তিন সংস্থার কার্যক্রমের দূর্বল সমন্বয়, মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলের অপ্রতুলতা এবং আর্থিক ও যানবাহন ইত্যাদির অভাবে এ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া জনগণের স্বতস্ফুর্ত সমর্থন ছাড়া এ দায়িত্ব পালন দূরূহও বটে।

জ. জলাশয় সেচে মাছ আহরণ

সেচের মাধ্যমে মাছ আহরণ মৎস্য উৎপাদনের এক ব্যাপক অন্তরায়। কারণ সেচের মাধ্যমে মাছ আহরণ করা হলে সব বয়সের সব প্রজাতির মাছ সমূলে বিনাশ হয়। এতে পরবর্তী মৌসুমে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন বিঘ্নিত হয়। পরিণামে মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়।

ঝ. জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব

বর্তমানে দেশের সকল জলাশয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত আছে। উক্ত মন্ত্রণালয় সরকারী হাওড় ও বিলগুলিকে ইজারা প্রদান করে থাকে। ইজারাদার ঐ সব জলাশয় হতে অধিক মুনাফার আশায় অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ করে থাকে। ফলে মাছের উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। এমনকি উন্নয়নের জন্যও সময়মত জলাশয় পাওয়া যায় না।

ঞ. অভয়াশ্রম

মুক্ত জলাশয়ে স্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখতে হলে অভয়াশ্রম স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জলমহালের মালিক ভূমি মন্ত্রণালয় হওয়ায় সারা দেশে কোন অভয়াশ্রম নেই যা মৎস্য উৎপাদনের এক বিরাট অন্তরায়। অভয়াশ্রম না থাকলে প্লাবনভূমিতে উৎপাদন ও মাছের বংশ হ্রাস পেতে বাধ্য।

প্লাবনভূমির মৎস্য ব্যবস্থাপনার সরকারী পদক্ষেপ

দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ প্লাবনভূমির অব্যবস্থা। তাই প্লাবনভূমির জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবি) এবং তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্প দুটি মূলত পরীক্ষা ধর্মী। দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ২০০০ হেঃ প্লাবনভূমি নার্সারীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিল, হাওড় ও মৌসুমী জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করা হয়। এই কার্যক্রমে ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৬০০ কেজি রেণু ও ১৫৮.০০ মেট্রিক টন পোনা মজুদ করা হয়। অন্যদিকে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত ৪৪৪০০ হেঃ এলাকায় পোনা মজুদ করা হয়। ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত সময়ে মোট ২৬০০ মেট্রিক টন পোনা ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন বিলে মজুদ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ

সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার প্লাবনভূমিতে পোনা মজুদের ফলে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বের চেয়ে ৩৮% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্পাধীন পোনা মজুদকৃত বিলে ইজারা মূল্য ২৬% থেকে ৩১% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জলাশয়ে পোনা মজুদের পর প্রায় ১০-১৫ গুণ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী এ কার্যক্রমটি ছিল পরীক্ষামূলক। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্লাবন ভূমির মাত্র ১.৬৪% এলাকায় পোনা মজুদ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা সম্ভব হয়। এ উদ্যোগের সফলতা ছিল উল্লেখযোগ্য। পোনা মজুদ কার্যক্রম লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় ইতোমধ্যে বেসরকারী লীজ গ্রহীতাগণ নিজ উদ্যোগে মুক্ত জলাশয়ে পোনা ছাড়া কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া প্লাবনভূমির মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক জন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্লাবনভূমিতে পোনা মজুদ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখা যায় বিল নার্সারী কার্যক্রমটি লাভজনক। কিন্তু তা সম্পূর্ণই প্রাকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কোন কোন বছর অতিবৃষ্টি, প্লাবন এবং কোন কোন বছর অনাবৃষ্টির ফলে পরিকল্পনামাফিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় না। কাজেই যে স্থানে যে পদ্ধতি কার্যকর হবে সে পদ্ধতি অনুযায়ী পোনা অবমুক্তি বা বিল নার্সারী ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। এ বিশাল প্লাবনভূমির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা সম্ভব হলে ৪-৫ গুণ বেশি মাছ প্লাবন ভূমি থেকে উৎপাদন ও আহরণ করা সম্ভব।

প্লাবন ভুমি ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশ

১. জলমহালগুলিকে অর্থ আদায়ের ক্ষেত্র হিসাবে চিতি না করে উৎপাদনমূখী ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এ লক্ষে প্লাবনভূমির সরকারী খাস জলাশয় যে গুলিতে সারা বছর পানি থাকে সে সব জলাশয় থেকে উপযুক্ততা নিরূপণ করে অভয়াশ্রম স্থাপন করা অপরিহার্য।

২. যে সব জলাশয় লীজ প্রদান করা হবে সেগুলোতে বাধ্যতামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ছাড়া স্বল্প মেয়াদী ইজারার পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সেচ প্রকল্পে ফিস পাসের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাঁধের ভিতরের এলাকায় ব্যাপক মাছ চাষ করতে হবে।

৪. পানি দুষণের হাত থেকে প্লাবনভূমিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. যে সব বিল ইতোমধ্যে পানিতে ভরাট হয়ে গেছে বা ভরাট হওয়ার পথে সেগুলোকে সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী উপযোগী হতে পারে।

৬. মৎস্য আইনসহ অন্যান্য আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৭. কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮. মৎস্যজীবীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. মুক্ত জলাশয়ের পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে এলাকা চি ত করে বিল নার্সারী বা পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

১০. মুক্ত জলাশয়ে সুফলভোগীদের সচেতনতা ও দক্ষ করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১১. মৌসুমী জলাশয়গুলি পুনঃখনন/সংস্কার করে ছোট ছোট খন্ড বদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি করে এ পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হলে মৎস্য উৎপাদন ব গুণ বৃদ্ধি হবে এবং এতে আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের পথ সুগম হবে।

উপসংহার

মুক্ত জলাশয়ে পোনা ছাড়া সুদূর প্রসারী প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন বিলে পোনা ছাড়ার ফলে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে এ কার্যক্রমে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে এ কার্যক্রমকে ব্যাপকভিত্তিক করা আবশ্যক। এ ছাড়া চি ত সমস্যাগুলি নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে প্লাবনভূমি থেকে মাছের উৎপাদন ব গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

উন্নতমানের পোনা উৎপাদনে ব্রুডমাছ সমস্যা ও সমাধান

এস.এন. চৌধুরী
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৎস্য অধিদপ্তর

ভূমিকা

বীজের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে ফসলের ফলন, আর বীজের গুণাগুণ নির্ভর করে , যে স্ত্রী-পুরুষ থেকে তার উদ্ভব, তার ওপর। এই সত্যটি মাছ চাষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতি তার আপন রীতিতে বিদ্যমান জীবজগতের প্রতিটি জীবের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ সংরক্ষণ করে আসছে। মানুষ তার মেধা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিয়ে প্রয়োজনীয় ফসল ও জীবজন্তুর গুণাগুণ উন্নততর করায় নিয়োজিত আছে। কিন্তু অজ্ঞতাবশত কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দেশের মধ্যে হ্যাচারীগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃত্রিম প্রজনন দেশে মাছের পোনা প্রাপ্তিতে বিশেষ অবদান রাখছে। মৎস্যচাষ এবং মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদের কার্যক্রম প্রসারিত হওয়ায় দেশে কার্পজাতীয় মাছের পোনার চাহিদা ব লাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্পজাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু পোনা উৎপাদনের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা নিম্নের ছক থেকেই বুঝা যায়।

বছর	উৎপাদিত পোনার পরিমাণ (কেজি)	
	প্রাকৃতিক	কৃত্রিম প্রজনন
১৯৮৮	১২৫৩৩	৫৬৯৭
১৯৮৯	১২২৩৫	৪৩১৫
১৯৯০	৫১২৮	১৩০১৪
১৯৯১	৬৮৫৫	২২১৭০
১৯৯২	৯৩৪২	৩৩০৭২
১৯৯৩	৪৯১৩	৪৩০৪৭
১৯৯৪	৫০০০	৪৯০০০
১৯৯৫	৫০০০	৭৫০০০

রেণু পোনা উৎপাদনের পরিমাণগত অগ্রগতির পাশাপাশি গুণগত অবনতি ও ঘটেছে। মাছের পোনার কাঙ্খিত বৈশিষ্টগুলোর অবনতি হওয়ায় মৎস্য চাষীরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। তাঁদের পুকুরে মাছ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না, সহজেই রোগাক্রান্ত হয়, অল্প বয়সেই এবং ছোট আকারেই পরিপক্কতা লাভ করে । ফলে সার্বিক উৎপাদন কমে যায়। তাই তারা নদীর পোনা আর হ্যাচারীর পোনার মধ্যে সুস্পষ্ট তুলনা তুলে ধরেন । যদি এখনই এ দিকে পদক্ষেপ নেয়া না হয়, তবে এই সমস্যা ভবিষ্যতে প্রকট হয়ে দেখা দিবে তাতে সন্দেহ নেই। গুণগত বৈশিষ্টের অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ব্রুড মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক নির্বাচন ও পরিচর্যার অভাব, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা সর্ম্পকে অজ্ঞতা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অনাকাঙ্খিত সংকরায়ন।

দেশে বর্তমানে প্রায় ৫০০টি ছোট বড় বেসরকারী হ্যাচারী আছে। এ সব হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদের অনেকেই কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের জটিল তাত্বিক জ্ঞান দিয়ে এদেরকে হ্যাচারী ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করাও সহজ নয়। তাই অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাবে সমস্যাগুলো সর্ম্পকে তাঁদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং সমাধানের জন্য প্রশিক্ষিত করতে হবে। শুধু যে বেসরকারী হ্যাচারীতেই এই সমস্যা তাই নয়,সরকারী হ্যাচারীতেও একই সমস্যা কিছুটা বিদ্যমান।

সকলেরই লক্ষ্য কেবল মাত্র পরিমাণগত উৎপাদন বৃদ্ধির, তাই পণ্যের সার্বিক গুণাগুণ সমুন্নত রাখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। কিন্তু কিছুটা সতর্ক ও সচেষ্ট হলেই তা সম্ভব। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপায়ে প্রজননিত চাষযোগ্য প্রজাতি

দেশে চাষযোগ্য অনেক প্রজাতির মাছ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি সীমিত স্থানে এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রজনন করে। এ সব প্রজাতির মধ্যে রুই,কাতলা,মৃগেল,কালিবাউস এবং বিদেশ থেকে আনা সিলভারকার্প,গ্রাসকার্প,বিগহেড কার্প,কমন/মিররকার্প ও থাইপুঁটি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কমন/মিরর ও থাইপুঁটি ব্যতীত অন্য প্রজাতি গুলো সাধারণত প্রবাহমান নদীতে প্রজনন করে। তাই দেশে পোনার চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে এসব প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো হয়। অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম প্রজননের প্রসারের কারণেই এসব প্রজাতিগুলো গুণগতমানের দিক থেকে সব চেয়ে বেশি অবক্ষয়িত হয়েছে। চাষযোগ্য অন্যান্য প্রজাতি গুলোহচ্ছে-পাংগাস (বিদেশী), মাগুর, (দেশী,বিদেশী), নাইলোটিকা, গুলসা, পাবদা, ব্লার্ক কার্প, মহাশোল, শোল এবং কৈ। এ গুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি এ দেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে এখনও চাষযোগ্য হয়ে উঠেনি।

ব্রুডের বর্তমান অবস্থা

একটি হ্যাচারীর উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা প্রয়োজন তা অনেক হ্যাচারীতেই করা হয় না। অবশিষ্ট মাছ আশেপাশের মাছ চাষের পুকুর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এনে প্রজনন ঘটানো হয়। এ অবস্থায় আকার, স্বাস্থ্য, পরিপক্কতার বয়স, বংশগতি, উৎপত্তির ইতিহাস কিছুই বিবেচনা করা হয় না, কেবল মাত্র পেটে ডিম আছে কিনা কিংবা পুরুষগুলোর মিল্ট আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়েই প্রজনন ঘটানোর জন্য সংগ্রহ করা হয়।

এছাড়া হ্যাচারীর পুকুরে যে সব ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই ২/৪ জোড়া ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা থেকেই তৈরী ব্রুড। পরবর্তীতেও বারংবার প্রজননিত একই ব্রুডের বংশধরদেরকে ব্রুডে পরিণত করা হয়। এতে অন্তঃপ্রজননের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ২-৩ বংশগতিতেই দেখা যায়।

বড় আকারের ব্রুড মাছের ডিমের পরিমাণ ছোট আকারের মাছের তুলনায় কম। তাই হ্যাচারী ব্যবস্থাপকরা তাদের ব্রুডগুলো ছোট করে রাখতে আগ্রহী। তা ছাড়া মাছের প্রজনন ঘটানোও সহজ এবং ডিমপাড়ার হারও বেশি। তাই বাণিজ্যিক সফলতার উদ্দেশ্যে গুণগতমান গৌণ হয়ে পড়ে।

ব্রুড নির্বাচন

হ্যাচারী ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সিংহভাগই নির্ভর করে ব্রুড মাছের উপর। তাই হ্যাচারীতে ব্রুড মাছ প্রতিপালনের জন্য সার্বিক এবং উন্নত মানের ব্রুড মাছ কিংবা পোনা নির্বাচন করে ভবিষ্যতের ব্রুডের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। এই কাজটি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সাথে করতে হয় । কোন জীব যখন অধিকতর বৈচিত্রপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে বাস করে তখন সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার মধ্যে নানা রকমে জেনেটিক বৈসাদৃশ্য (Genetic Variability) গড়ে উঠে। তাই প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত ব্রুড মাছ হ্যাচারীতে পালনের মাধ্যমে ভালগুণসম্মত খামারে পালনের উপযোগী করে নেয়া যায়। কোন হ্যাচারী যদি আগে থেকে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত ব্রুডের প্রজননের মাধ্যমে নিজস্ব ব্রুডের মজুদ গড়ে থাকে তার কাছ থেকেও ব্রুড সংগ্রহ করা যেতে পারে ।

ব্রুড নির্বাচনের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক উৎস যেমন হালদা, যমুনা,ব্রহ্মপুত্র,পদ্মা প্রভৃতি নদ-নদীর প্রজনন ক্ষেত্র থেকে রেণুপোনা সংগ্রহ করাই শ্রেয়। সংনগৃহীত রেণু পোনা পুকুরে পালনকালে তার মধ্যে থেকে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত,স্বাস্থ্যবান,সবল,নিখুঁত অবয়বের পোনা গুলোকে ভবিষ্যতের ব্রুড হিসেবে নির্বাচিত করা উচিৎ।

এ ছাড়া একই উৎস্য থেকে মাছ সংগ্রহ না করে দূর-দূরান্তের সর্বাধিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন । দূরবর্তী বিভিন্ন হ্যাচারীর মধ্যে ব্রুড বিনিময়ের মাধ্যমেও এটি করা যায় ।

ব্রুড প্রতিপালন

হ্যাচারীতে যে সংখ্যক মাছ প্রজনন কাজে ব্যব ত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি মাছ সংগ্রহ করতে হবে। তবে এই সংখ্যা নির্ভর করবে হ্যাচারীর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার উপর। যত ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় তার মধ্যে প্রায় ৫% যথাযথ পরিপক্কতা লাভ করে না, ১০% প্রজনন করে না, এবং ১০%-১৫% মাছ পুকুরে থেকে যায়, যা জাল দিয়ে ধরা যায় না। এই বাড়তি হিসাব ধরেই ব্রুডের প্রাথমিক সংখ্যা নিরুপণ করতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় যত বেশি উৎস থেকে ব্রুড সংগ্রহ করা যাবে ততই তা থেকে ভাল গুণসম্পন্ন পোনা পাওয়া যাবে।

ব্রুড প্রতিপালনের জন্য যথারীতি পুকুর প্রস্তুত করে সারও সম্পূরক খাবার দিয়ে এবং পানির পরিমাণ ও গুণাগুণ সুষ্ঠভাবে বজায় রেখে পরিচালনা করতে হবে । সম্পূরক খাদ্য অবশ্যই সুষম হতে হবে এবং তা ভিটামিন,প্রোটিন,খনিজ লবণযুক্ত হতে হবে । মাঝে মাঝে পানি পরিবর্তন ব্রুডের পরিপক্কতা লাভে বিশেষ সহায়ক হয়।

ব্রুডমাছ প্রতিপালন কালে যে সব মাছ সুষ্ঠুভাবে বাড়ে না,রোগাক্রান্ত,বিকলাংগ,সেগুলো তুলে ফেলতে হবে ।

প্রজননক্ষম কাতলা মাছ উৎপাদন অন্যান্য মাছের তুলনায় কঠিন। তাই কাতলার সাথে সিলভার কার্প এবং বিগহেড কার্প না রাখাই -বাঞ্চনীয় । একর প্রতি ৭০০-৯০০ কেজি ব্রুড মজুদ রাখা শ্রেয়।

হ্যাচারীতে ব্যবহারযোগ্য মাছের আকার

ইদানিং প্রায়ই দেখা যায় অত্যন্ত ছোট আকারের কার্পজাতীয় মাছ প্রজনন করানো হয়। এতে ভবিষ্যত বংশধরদের গুণগতমান অধঃপতিত হয়। তাই নিম্নবর্ণিত আকার ও বয়সের মাছ প্রজনন করানো উচিত।

প্রজাতি	সর্বনিম্ন বয়স(বছর)	সর্বনিম্ন আকার (কেজি)
কাতলা	৩+	৪+
রুই	২	১.৫+
মৃগেল	২	১.৫+
কালিবাউস	২	১+
সিলভারকার্প	২+	২+
গ্রাসকার্প	২+	৩+
বিগহেড	২+	২+
কমনকার্প	১+	১.৫+
মিরর কার্প	১+	১.৫+
রাজপুঁটি	১	০.৫
ব্লাক কার্প	৫	৬

ব্রুড প্রতিস্থাপন

ব্রুড মাছ ব্যবহারের ফলে প্রতি বছরই কিছু ব্রুড নষ্ট হয়। এ গুলো পূরণের জন্য ২/১ টি পুকুরে প্রাকৃতিক উৎসের কিংবা অন্য কোন দূরবর্তী স্থান থেকে সংগৃহীত গুণগত মানসম্পন্ন পোনা প্রতিপালনের সংস্থান রাখতে হবে। এই পোনা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল ও স্বাস্থ্যবান মাছগুলো পরিত্যক্ত ব্রুড মাছ প্রতিস্থাপনে নিয়মিত ব্যবহার করা যায়।

বিদেশী প্রজাতির মাছগুলো দীর্ঘদিন আগে এদেশে আনা হয়েছে। এদের অন্তঃপ্রজনন ঘটার ফলে গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা সরকারের সহায়তায় বেসরকারী উদ্যোগে বিদেশ থেকে নতুন ব্রুড মাছ আনার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

দেশের হ্যাচারীতে ব্রুডের চাহিদা

দেশে কার্পজাতীয়মাছের রেণু পোনার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৯৫০০০ কেজি। তবে উৎপাদন ক্ষমতা আরও বেশি। এই রেণু পোনা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ১০০০ মেঃ টন ব্রুড মাছ। এই ব্রুড প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১০০০ হেঃ জলায়তন। দেশের সরকারী মৎস্য খামার গুলোতে ব্রুড প্রতিপালনের মাধ্যমে আংশিক চাহিদা মেটানো সম্ভব।

৯। হ্যাচারীতে ব্রুড ব্যবস্থাপনার ছক

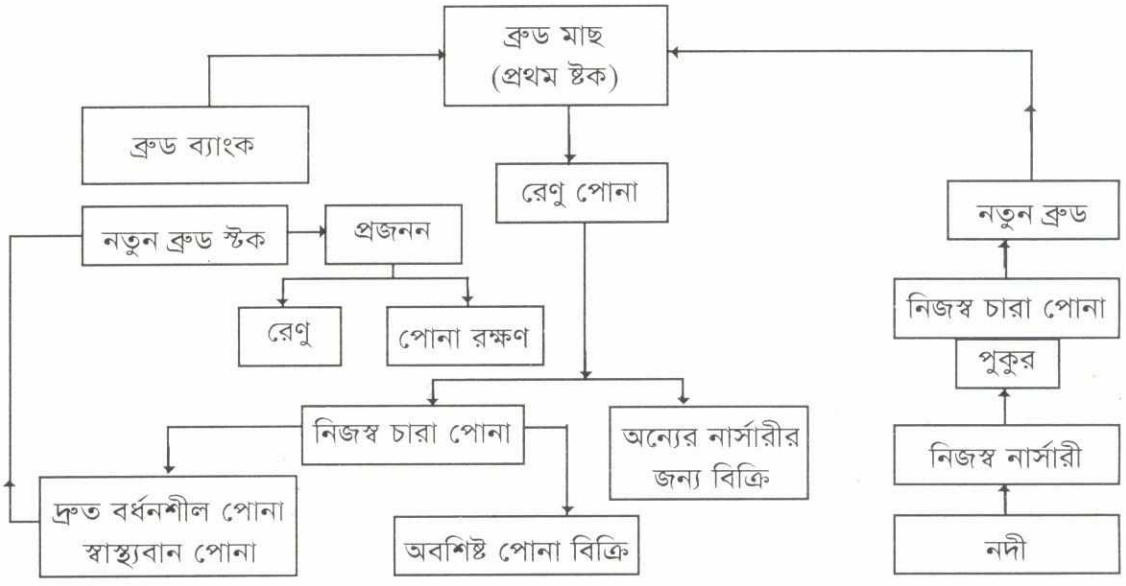

ব্রুড ব্যাংক স্থাপন

উন্নত মানের কৌলিতাত্বিক বৈচিত্র সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন সাধারণ হ্যাচারী মালিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি একটি গবেষণা ধর্মী কাজ। এর দায়িত্ব মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউটকে নিতে হবে। উন্নত জাতের বীজ তৈরি করে মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট মৎস্য অধিদপ্তরের খামারসমূহে প্রতিপালনের জন্য সরবরাহ করবে। মৎস্য খামারসমূহে এগুলো ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের হলে তা হ্যাচারী মালিকদের নিকট নির্ধারিত সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা যেতে পারে। হ্যাচারী মালিকগণ তাঁদের নিজস্ব পুকুরে প্রতিপালন করে ভবিষ্যতের ব্রুড হিসাবে তৈরি করে নেবেন। সরাসরি নির্ধারিত পূর্ণ ওজনের ব্রুড সরকারি খামারে তৈরি করতে হলে অনেক পরিমাণ জলায়তনের প্রয়োজন,যার সংস্থান করা কঠিন। তাছাড়া বৃহদায়তনের ব্রুড দূর-দূরান্তের হ্যাচারীগুলোতে পরিবহন করা কষ্টকর,ঝুকিপূর্ণ এবং ব্যয়সাধ্য। বিকল্প পন্থা হিসেবে ক্রমান্বয়ে বেসরকারী পর্যায়েও ব্রুড ব্যবসায় গড়ে উঠার সম্ভবনা অবাস্তব নয়। আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে যথাযথ কারিগরী

প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারী আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ব্রুড ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে । এটি একটি লাভজনক ব্যবসা । মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট এদেরকে মান সম্পন্ন ব্রুডের পোনা সরবরাহ করতে পারে ।

তৃতীয় পন্থা হিসেবে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে সব অঞ্চলে হ্যাচারী শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে ব্রুড খামার প্রতিষ্ঠা করে কিংবা নিকটস্থ মৎস্য অধিদপ্তরীয় খামারগুলোকে ব্রুড খামারে পরিণত করে মানসম্মত ব্রুড সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে।

সরবরাহ পদ্ধতি

ব্রুড মাছ বিভিন্ন হ্যাচারীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবহনের ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারেরই (মৎস্য অধিদপ্তর) গ্রহণ করা সমীচীন । এজন্য উন্নত পরিবহন অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্রুড ব্যাংকে উৎপাদিত ব্রুড মাছ নো-লস নো-প্রফিট-(No loss no profit) মূল্যে সরবরাহ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

হ্যাচারী মালিকের করণীয়

হ্যাচারীতে বিদ্যমান অন্তঃপ্রজনন সমস্যাসংকুল ব্রুডগুলো ক্রমান্বয়ে সরিয়ে ফেলে সরবরাহকৃত উন্নত কৌলিকতাত্বিক গুণসম্পন্ন ব্রুড আলাদা পুকুরে সংরক্ষণ করা উচিত,কোন ক্রমেই যেন আগের ব্রুডের সংগে মিশে না যায়। নিজস্ব হ্যাচারীতে উন্নত মানের ব্রুড উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা লাভ না করা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্রুডের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে ।

মৎস্য অধিদপ্তর এবং মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট যৌথভাবে সকল হ্যাচারী মালিকদেরকে ব্যবস্থাপকদেরকে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসন এবং কৌলিতাত্বিক বৈচিত্র সম্পন্ন ব্রুড তৈরির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিবেন। তাছাড়া এই প্রবন্ধে আলোচিত পরামর্শ মত ব্রুড প্রতিপালন করলে ক্রমান্বয়ে হ্যাচারীতে উন্নত গুণসম্পন্ন ব্রুড তৈরি করা সম্ভব।

অনাকাংখিত সংকরায়ন থেকে বিরত থাকার জন্য হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদের সচেষ্ট হতে হবে । নতুবা মূল প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কেবল মাত্র গবেষণা লব্ধ লাভজনক সংকরায়ন করা উচিত।

উপসংহার

দেশে বর্তমানে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার প্রাচুর্যই প্রতিষ্টিত হচ্ছে। ইদানিং হাওড়,বাওড় ও বিলে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা মজুদ করা হচ্ছে। পোনাগুলোর অধিকাংশ অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা প্রসূত। মূক্ত প্রবাহমান জলাশয়, যেখানে কার্পজাতীয় মাছের প্রজনন ঘটে সেখানে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা মজুদ না করাই শ্রেয়। প্রাকৃতিক উৎসে কৌলিতাত্বিক বৈচিত্র সম্পন্ন মূল জেনেটিক মজুদ অবশ্যই সংরক্ষণ এবং অক্ষত রাখা উচিত। হ্যাচারীতে ব্রুডের অবক্ষয় যতটা না ইচ্ছাকৃত তার চেয়ে বেশি অজ্ঞতাজনিত। তাই হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদেরকে অবিলম্বে পর্যায়ক্রমে ব্রুড ব্যবস্থাপনা এবং হ্যাচারী পরিচালনায় বিশদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দেশে বর্তমানে মাত্র ৫০০ টি হ্যাচারী রয়েছে। সুতরাং এদেরকে প্রশিক্ষিত করা কঠিন কাজ । হ্যাচারী মালিকদের মনে রাখতে হবে, তারা বীজ উৎপাদনকারী। পুকুর-মালিকরা সেই বীজের সর্বশেষ প্রকৃত ব্যবহারকারী,তাই ব্যবহারকারীরা যদি বীজের সন্তোষজনক ফলাফল না পায় তবে শুধু সেই ব্যক্তি নয় গোটা দেশই মৎস্য উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই দেশের স্বার্থে উন্নত ব্রুড ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
থানা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খারে অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতীয় আয়ের ৪.৭ শতাংশ, রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ, কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ১০ শতাংশ এবং প্রানিজ আমিষ সরবরাহের ৬০ শতাংশ এ খাতের অবদান । যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ জননগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহনের সুযোগ বিদ্যমান । প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে দেশে মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে । বিগত সাত বছরে মৎস্য উৎপাদন ৮.৪৭ লক্ষ টন (১৯৮৯-৯০) থেকে ১৩.৭৩ লক্ষ টনে (১৯৯৬-৯৭) বৃদ্ধি করা হয়। এ সময়ে দেশে মৎস্য উৎপাদনের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.৫ ভাগ যা চাহিদার এবং উন্নয়ন সুযোগের তুলনায় কম ।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সমস্যাবলী

দেশে বদ্ধ জলাশয়ের ক্রমাগত হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ সেবা সীমিত থাকায় বদ্ধ জাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । জলাশয়ে অতি মাত্রায় মৎস্য আহরণ, মৎস্য প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলোর পরিবেশগত ক্ষতিসাধন ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে । সাদুদ্রিক মৎস্যের ক্ষেত্রে আর্টিসোনাল মৎস্যজীবী সংখ্যাধিক্যের জন্য মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় উপনীত হয় । দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের পথে চিহ্নিত সমস্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. মুক্ত জলাশয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় মৎস্য মজুদ ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ কৌশল নিরুপন করা কঠিন । দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সৃষ্টি সমস্যাদি যেমন কৃষি কাজে সেচের জন্য অত্যধিক হারে পানি নিষ্কাশন, বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, নগর ও পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থের দ্বারা জলাশয় দূষণ, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিকভাবে মাছের মজুদে বাধা সৃষ্টি, মৎস্য প্রজনন ও বিচরন ক্ষেত্রগুলো বিনষ্ট করে ফেলা ।

খ. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে বেসরকারী পুকুর-দীঘির যৌথ মালিকনা, সরকারী জলাশয়ের ব্যবহার অধিকার এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালার অভাব, আন্তঃখাতে জলাশয়ের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার, বিনিয়োগের নিমিত্তে ব্যক্তিগত পুজির অভাব, উৎপাদন সামগ্রী এবং যন্ত্রপাতির অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা এবং মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ।

গ. উপকুলীয় চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ির পোনা এবং উৎপাদন সামগ্রীর অপ্রাপ্যতা, উপযুক্ত মৌলিক অবকাঠামোর অভাবে আধুনিক ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সমস্যা, উপকুলীয় মেনগ্রুভ বনাঞ্চলের পরিববেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ি পোনা প্রাপ্তির জন্য অধিকমাত্রায় নির্ভরতা, চিংড়ি রোগ-বালাই, উচ্চ বিনিয়োগ খরচ, ভূমি ব্যবহারে আন্তঃখাতের প্রতিযোগিতা, নিরাপত্তার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রযুক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সমন্বিত নীতিমালার অভাব ।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে উপকুলীয় অঞ্চলে মৎস্য ও চিংড়ি অতি আহরণের ফলে উৎপাদন হ্রাস, বে ন্দি জাল, বেড় জাল, চিংড়ি পোনা ধরার ঠেলা জাল, দেশীয় সাধারণ ও যান্ত্রিক মাছ ধরা ইউনিট দ্রুত বৃদ্ধি ও অতি আহরণের ফলে মাছের মজুদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন । সাগরের ডিমাসেল মৎস্য ও চিংড়ি অতিমাত্রায় আহরণ, সাগরের পেলাজিক মাছের আহরণ প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদির অভাব, মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত সীমিত তথ্য এবং জ্ঞানের অভাব, ব্যবস্থাপনা নীতির অভাব, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও বন্দরের অপ্রতুলতা ।
মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব চি তি সমস্যাদি ভবিষ্যৎ কর্মসুচি গ্রহণের কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে ।

উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের স্থিতিশীল সুবিধা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সেবা প্রদান, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন এবং বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা । পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলো ঃ

- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন ।
- মৎস্য ও মৎস্য সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ।
- মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী এবং মৎস্য খাতে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।
- চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা ।
- জলজ পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নীত ।
- মৎস্য সম্পদের জৈবিক ও প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া সমূহের উন্নয়ন ।
- মৎস্য আহরনোত্তর ক্ষতি কমানোর নিমিত্তে মৎস্য অবতরণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণের জন্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান উন্নয়ন ।
- মৎস্য গবেষণা, ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড উন্নয়ন ও জোড়দারকরণ ।

উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচি

১. মুক্ত জলাশয়

দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টরের বেশি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় রয়েছে যা মৎস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী । পঞ্চম পরিকল্পনাকালে মুক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন উৎস যথা- নদ-নদী, বিল ও বাওড়, কাপ্তাই লেক, প্লাবনভুমি এবং আধা-বদ্ধ জলাশয়ের বর্তমান উৎপাদন ৬.৫৮ লক্ষ টন হতে ১০.৯৮ লক্ষ টনে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় (সারণি-১) । মুক্ত জলাশয়ে বর্ধিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়ার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হবে তা নিম্নরুপ ঃ

ক. মৎস্য আইন প্রয়োগ জোরদারকরণ এবং মৎস্যজীবীদের অংশীদারিত্বমূলক সমাজ ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা করা ।
খ. নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, প্লাবনভূমি এবং আধা-বদ্ধ জলাশয়ে দ্রুত বর্ধনশীল মাছের পোনা বিপুল পরিমাণে মজুদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।
গ. প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ ও চিংড়ির পোনা আহরণ সীমিতকরণ বা বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।
ঘ. সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ, সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মাণ শিল্প-কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মান পূর্বক মৎস্য সম্পদের উপর তার প্রভাব নিরুপন করে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা ।
ঙ. জলজ পরিবেশের দুষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃষিকাজে ব্যব ত কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত করা এবং কল-কারখানা ও পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থ মুক্ত জলাশয়ে নিক্ষেপ না করা অথবা নিক্ষেপের পূর্বে যথাযথ ট্রিটমেন্ট করার নিশ্চয়তা বিধান করা ।

চ. মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য মুক্ত জলাশয়ে বিশেষ উপযোগী স্থানে অভায়াশ্রম স্থাপন করা এবং মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা ।

ছ. চাষ ভিত্তিক প্লাবনভূমির মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার এবং ধান ক্ষেতে মাছ চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রসার করা ।

২. বদ্ধ জলাশয়

দেশের বদ্ধ জলাশয়গুলো মাছ উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময় উৎস । বর্তমানে ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর পুকুর এবং ৬ হাজার হেক্টর বাওড় এবং অসংখ্য চাষোপযোগী মৌসুমী জলাশয় রয়েছে । মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারী পুকুরে প্রদর্শণ, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন প্যাকেজ কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে । ফলে, পুকুর দীঘিগুলোতে মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৭০০ কেজির বিপরীতে বর্তমানে ১৯০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। দেশের বাওড় ও বিলগুলিতে উপকারভোগীদের অংশিদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনায় মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি হতে ৭০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে । বর্তমান পঞ্চম পকিল্পনা কালে বদ্ধ জলাশয়গুলোর বিভিন্ন উৎস যথা- পুকুর, দীঘি ও বাওড়ে মৎস্য প্রযুক্তি উন্নয়নে ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৩.৩৫ টন হতে ৪.৭৭ লক্ষ টনে উন্নীত করা কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে (সারণি-১) ।

সারণি- ১ ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

উৎপাদনের উৎস	১৯৯৬-৯৭ইং সনের বেঞ্চমার্ক	২০০১-২০০২ইং সনের লক্ষমাত্রা
১.০ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	১০৭৯.০০	১৬৭৫.০০
১.১ মৎস্য চাষী		
পুকুর	৩৩১.৯০	৪৫০.০০
বাওড়	৩.৫০	২৭.০০
১.২ উপকূলীয় চিংড়ি	৮৫.০০	১০০.০০
১.৩ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ		
নদী	১৬৫.০০	১৮০.০০
বিল ও হাওড়	৭০.০০	৯৫.০০
কাপ্তাই লেক	৭.৬০	৯.০০
প্লাবনভূমি	৩৯৫.০০	৭৫১.০০
আধা-বদ্ধ জলাশয়	২১.০০	৬৩.০০
২.০ সামুদ্রিক মৎস্য	২৯৪.০০	৪০০.০০
মোট (১ + ২)	১৩৭৩.০০	২০৭৫.০০

মৎস্য চাষের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবে ঃ

ক. উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি চাষীদের মাঝে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শণ ও সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে প্রসার করা ।

খ. পুকুর উন্নয়ন আইন প্রয়োগ জোড়দার করার মাধ্যমে দেশের সকল বদ্ধ জলাশয় সমূহে মৎস্য চাষ বাধ্যতামূলক করা।

গ. দ্রুত বর্ধনশীল এবং উচ্চফলনশীল প্রজাতির মাছ চাষাবাদে জনগণকে উৎসাহিত করা ।

ঘ. থানা পর্যায়ে বেসরকারী উদ্দোক্তাদের জন্য মৎস্য চাষের বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজ কর্মসূচির উপর প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষন পরিচালনা করা ।

ঙ. অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে বিশেষ করে কৃষি ও পশু পালণ কর্মসূচির সাথে সমন্বিত মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

চ. মৎস্য চাষীদের জন্য সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা। এন.জি.ও. এর মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য ঋণ সুবিধা বিস্তার করা।

ছ. ভুমিহীন ও গরীব চাষীদের সরকারী খাস জলাশয় বন্দোবস্ত/ব্যবহার অধিকার প্রদান করা।

জ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

৩. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের উপকূলীয় লোনা পানি অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে। বিগত ১০ থেকে ১২ বছরে চিংড়ি চাষের আয়তন ৫০ হাজার হেক্টর থেকে ১.৫০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে এবং চিংড়ির উৎপাদন ১১ হাজর টন থেকে ৪৫ হাজার টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আধা-নিবিড় পদ্ধতি চালূ করায় কিছু সংখ্যক খামারে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩-৫ টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১.৫ হাজার হেক্টর খামারে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমানে চিংড়ি রোগ বালাই দমন সহ খামার ব্যবস্থাপনার উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বেসরকারী উদ্দোক্তাদের জন্য হ্যাচারী স্থাপন চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে চলতি পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ৬০ হাজার টন চিংড়ি উৎপাদন করা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় (সারণি-১)। এই কর্মসূচি বাস্তাবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা হয় ঃ

ক. উপকূলীয় এলাকায় জনগণকে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে জড়িত করা।

খ. চিংড়ি খামারের সংখ্যা ও আয়তন সীমিত রেখে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

গ. উন্নত লাগসই ও পরিবেশ বান্তব প্রযুক্তি প্রসারে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. বেসরকারী খাতে চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনে উপদেষ্টা সেবা মনোনিবেশ করা।

ঙ. প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির পোনা আহরণ পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করা।

চ. হ্যাচারীদে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ছ. চিংড়ির রোগ বালাই নির্ণয়ের জন্য দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন করা এবং চিংড়ি রোগ দমনের নিমিত্তে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।

জ. চিংড়ি চাষীদের সুবিধার্থে মৌলিক সাধারণ অবকাঠামো উন্নয়ন চিংড়ি খাদ্য ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী এবং সরঞ্জামাদি প্রাপ্যতা নিশ্চয়তা বিধান করা।

ঝ. চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজার উন্নয়নের স্বার্থে চাষের পর্যায় হতে আহরনোত্তর প্রক্রিয়াকরণ পর্যায় পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তিগত শৃংখলা অনুসরণ করা।

৪. সামুদ্রিক মৎস্য কার্যক্রম

দেশের ৪৮০ কিঃমিঃ বিস্তীর্ণ উপকূল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১.৬৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক জলাশয় আছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ৮৫ হাজার চন থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ২.৬০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। সমুদ্র থেকে আহরিত মৎস্যের ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্রায়তন আর্টিসেনাল মৎস্যজীবীদের অবদান। বর্তমানে আর্টিসেনাল মৎস্যজীবীদের ৩.৪ হাজার ইঞ্জিন চালিত নৌকা এবং ১.১৪ লক্ষ সন্তনী নৌকা যোগে উপকুলে মৎস্য আহরণ করে। তাছাড়া ৭০টি বাণিজ্যিক ট্রলার সমুদ্রে মৎস্য ও চিংড়ি আহরণ করা জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ফলে মৎস্য আহরনে আর্টিসেনাল এবং বাণিজ্যিক ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ ২.৯৪ লক্ষ টন। চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এ খাতে উৎপাদন ৪.০০ লক্ষ টনে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে (সারণি-১)। এ লক্ষ্য মাত্রায় উপনীত হওয়ার জন্য নিম্নে বর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবে ঃ

ক. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় আহরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

খ. চিংড়ি সহ কতিপয় ডিমারসেল মাছের প্রজনন ক্ষেত্রে ভরা প্রজনন মৌশুমে আহরণ বন্ধ রাখা।

গ. গভীর সমুদ্রে পেলাজিক মাছের আহরণ ক্ষেত্র জরিপের মাধ্যমে চি িত করে আহরণ কৌশল উদ্ভাবন করা।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করা ।

ঙ. বিস্তীর্ণ উপকূলে সনাতনী ও যান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণের উপরে আইনের ধারা সমূহ কার্যকর করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৫. মৎস্য উৎপাদন এবং রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা

দেশে বর্তমানে জনপ্রতি দৈনিক মাছের প্রাপ্যতা গড়ে ২৫.৬ গ্রাম । পঞ্চম পরিকল্পনাকালে জনপ্রতি দৈনিক মাছ প্রাপ্যতার লক্ষ্যমাত্রা গড়ে ৩৪.৪৩ গ্রামে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । ফলে এ পরিকল্পনার সমাপনী সনে মোট মৎস্য উৎপাদন চাহিদা হবে ১৯.৩৫ লক্ষ টন । এ পরিকল্পনার শেষে দেশের জনসংখ্যা ১৩ থেকে ২৫ কোটি হিসাবে উৎপাদন চাহিদার হিসাব করা হয়েছে। উক্ত সনে আর্ন্তজাতিক বাজারে চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ৯৫ হাজার টন (সারণি-২) এবং শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ১৫ হাজার টন মাছ ব্যবহার হবে বলে ধরা হয়েছে ।

সারণি- ২ : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য রপ্তানি আয়ের লক্ষমাত্রা

পণ্যের নাম	১৯৯৬-৯৭ইং বেঞ্চমার্ক		২০০১-২০০২ইং লক্ষমাত্র	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
চিংড়ি	২৮.০০	১৩১৫.০০	৭০.০০	১৮৪৩.৮০
মাছ	৯.৮০	২২৫.০০	২০.০০	৪০৮.০০
অন্যান্য	৫.৫০	৬০.০০	৫.০০	৫১.০০
মোট	৪৩.৩০	১৬০০.০০	৯৫.০০	২৩.০২

চাহিদার লক্ষমাত্রা বিবেচনায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পকিল্পনাকালে ২০.৭৫ লক্ষ টন মাছ উৎপাদন করা প্রয়োজন হবে। এ পরিকল্পনা কালে হিমায়িত মাছ, চিংড়ি এবং মৎস্যজাত পণ্য আর্ন্তজাতিক বাজার উন্নয়নের স্বার্থে মাননিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া হবে। ফলে এ পরিকল্পনার সমাপনী সনে মাছ, চিংড়ি এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ৪৩.৩০ হাজার টন থেকে ৯৫.০০ হাজার টনে বৃদ্ধি করার মাত্রা নির্ধারণ করা হয় যার মূল্য প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা(সারণি- ২)।

উপসংহার

মৎস্য সেক্টর বিগত পরিকল্পনাকালে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিনিয়োগ সার্থকতা এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উৎস্য সমূহের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গতিধারার আলোকে এ সেক্টরের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সরকারি খাতে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে বেসকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য । অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ অতিমাত্রায় আহরণের ফলে উৎপাদন হ্রাসের ক্রমধারা বন্ধের নিমিত্তে বিস্তৃত মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের অংশীদারিত্বমূলক সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের কৌশল প্রবর্তন করা উচিৎ । সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন আর্টিসেনাল এবং বাণ্যিজিক ট্রলার বহরের প্রসারে বিনিয়োগ সীমিত থাকায় অনাহরীত গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ আহরণের প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং নতুন ক্ষেত্র চি িত করে বিনিয়োগের উৎস্য সৃষ্টি করা সম্ভব । মিঠাপানির বদ্ধ জলাশয় এবং উপকূলীয় লোনাপানির জলাশয়ের বিস্তৃতি, উৎপাদনশীলতা প্রযুক্তি প্রয়োগের পর্যায় বিবেচনা করে মৎস্য ও চিংড়িচাষ উন্নয়নের জন্য লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করা কৌশল অবলম্বন করা হলে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন ব গুনে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে । তবে, হিমায়িত মাছ ও চিংড়ির আর্ন্তজাতিক বাজার উন্নয়নের স্বার্থে চাষের পর্যায় হতে আহরনোত্তর প্রক্রিয়াকরণ পর্যায় পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তিগত শৃংখলা অনুসরণ করা বাধ্যবাধকতা হতে হবে । মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ চাহিদার আলোকে প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ প্রসার করা এবং সর্বোপরি মৎস্যদজীবী ও মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন এ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায় ।

বর্জ্য পানিতে মাছ চাষ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ও
আনোয়ারী বেগম শেলী
প্রকল্প সমন্বয়কারী (মাৎস্য), কারিতাস

সাধারণভাবে বর্জ্য পানিকে পরিত্যাজ্য এবং অবাঞ্চিত বর্জ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ইদানিং পানিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সরাসরি নির্গমনে না গিয়ে পুনঃ ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে যেমন চীন, থ্যাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইসরাইল, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিকাজ ও মাছ চাষের মত গুরুত্বপূর্ণ চাষাবাদ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের দেশে শহরাঞ্চলের ময়লা পানি প্রবাহিত হয়ে কোন খাল, বিল ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয়ের সাথে মিলিত হচ্ছে। ফলে আশঙ্কজনক হারে জলজ পরিবেশকে দূষণ করছে।

বর্জ্য পানির মিশ্রণ জটিল প্রকৃতির এতে অনেক প্রকার জৈব, অজৈব ও খনিজ পদার্থ থাকে। এগুলোর বর্ণ এবং ঘনত্ব বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন- বসতিপূর্ণ এলাকার ময়লা পানির গুণাবলী কল-কারখানা সমৃদ্ধ এলাকা থেকে ভিন্ন হতে পারে। এতে সার সমৃদ্ধ উপাদান থাকে । সাধারণত এই পানিতে ১% কঠিন পদার্থ সারের মধ্যে নিহিত উপাদানগুলি কাঙ্খিত পরিমাণে রয়েছে। যেমন- নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম। এ সব উপাদান পানিতে প্লাঙ্কটন, বেনথোস ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। বর্জ্য পানি উদ্ভিদকণার আধিক্য, প্রাণিকণা এবং তলদেশে বসবাসকারী প্রাণী উৎপাদনে সহায়ক। সুতরাং মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উপাদানই বর্জ্য পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। এক কথায় বর্জ্য পানিকে মাছের খাবার তৈরীর প্রাকৃতিক মাধ্যম বলে গণ্য করা যায়।

ভারতের কলকাতা শহরের কাছাকাছি ৩টি ময়লা পানিতে মাছ চাষ প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরছি।

১. রহড়া ময়লা পানিতে মাছ চাষ কার্যক্রম

২৪ পরগনা জেলার রহড়া নামক স্থানে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই খামারে বর্জ্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরে হেক্টর প্রতি ৭ টন মাছ উৎপাদন করা গেছে। ১৯৭৫ সালে মাত্র দুটো ভাড়া করা পুকুরে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হলেও আশির দশক থেকে ১০.৫ হেঃ জমি নিয়ে খামারটিতে লাভজনক ভাবে মাছ, ধান ও শাক-সবজি চাষ করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্য পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত। উল্লেখ্য যে, এরূপ চাপ পদ্ধতির উৎপাদন খরচ খুবই কম। এরূপ চাষ পদ্ধতিতে কোন খাবার এবং সার ব্যব ত হয় না।

অবকাঠামো

- উল্লেখিত খামারটিতে ৬ হেঃ জলায়তনের ১০টি অগভীর পুকুর (.০২-.০৪ হেঃ) ৯টি চারা উৎপাদন পুকুর ষ.০৪-.০৪ হেঃ), ১২টি মজুদ পুকুর (.১-.৪ হেঃ), ২টি ব্রুড পুকুর (১-৩ হেঃ) এবং ৩টি ধানের সাথে মাছ চাষের প্লট (.০২-.৩৮ হেঃ) এবং ৭টি সার্কুলার ট্যাঙ্ক (.১৪ হেঃ প্রতিটি) আছে।
- আধুনিক যন্ত্রপানি সমৃদ্ধ একটি গবেষণাগার, একটি ষ্টোর, একটি ট্রেনিং হল রয়েছে।
- শাক-সবজি চাষাবাদের জন্য ১ হেঃ এর একটি জমি রয়েছে সেখানে সারা বছর উৎপাদন হয়।
- একটি গভীর নলকূপ - প্রয়োজনে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে।
- একটি মিক্সিং ট্যাংক, ১টি সেডিমেন্ট ট্যাংক সংযোগ পাইপ ও নির্গমন পাইপ রয়েছে।

ময়লা পানিতে মাছ চাষ পদ্ধতি

রহড়া খামারের পুকুরের গড় গভীরতা ১ মিটার। রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প, গ্রাস কার্প, বাটা, রেবা, তেলাপিয়া ও গলদা চিংড়ি সেখানকার চাষযোগ্য প্রজাতি। তবে যেহেতু ময়লা পানিতে উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন বেশি সেজন্যে সিলভার কার্পের উৎপাদন অত্যন্ত সন্তোষজনক। বর্জ্য জলে পর্যাপ্ত লেমনা, স্পাইরো ডেলো, উলফিয়া জন্মায়। ফলে পানির দূষণ কমায় এবং গ্রাস কার্পের ভাল ফলন দেয়।

রহড়া খামারে পোনা মজুদের অনুপাত সিলভার কার্প ৭০%, কাতলা ১০%, রুই ১০% এবং মৃগেল ১০%, পুকুরে ৩" - ৪" পোনা মজুদ করা হয়। কোন সম্পূরক খাবার বা সার দেওয়া হয় না। শুধু প্রতিমাসে একর প্রতি ১৫ কেজি চুন ব্যবহার করা হয়। পোনা মজুদের ২ মাস পর থেকে সারা বছর মাছ ধরা ও ছাড়া হয় খামারের বার্ষিক মাছ উৎপাদন ৫ থেকে ৭ টন। মাছ ময়লা পানি থেকে ছাঁকনীর মত প্লাঙ্কটন, ব্যাকটেরিয়া খাবার হিসেবে তুলে নেয়। এতে করে, পানি দূষণ মুক্ত হয় বলে সংস্থার পরিচালক মিঃ সি, আর, দাশ জনালেন। এ ছাড়া কৃষি জমি ও শাক-সবজি বাগানেও এই পানি ব্যব ত হচ্ছে। সার, কীটনাশক ব্যবহার ছাড়া সেখানে (পুকুর পাড়ে) ১০৭ টন শাক-সবজি উৎপাদিত হয়েছে। শাক-সবজির অবশিষ্টাংশ মাছের খাবার হিসেবে ব্যব ত হচ্ছে।

২. ক্যাপ্টেনভেরী

ময়লা জলের মাছ চাষের সকল অভিজ্ঞতা রয়েছে ক্যাপটেন ভেরী নামক জলাশয়ে সেখানে ১৬ হেঃ জলাশয়ে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে। প্রতি হেক্টরে ২০,০০০ পোনা মজুদ করে বছরে ৮.৮ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে (১৯৯৬ সালে)। রুই জাতীয় মাছের সাথে তেলাপিয়া ক্যাপ্টেন ভেরীর নির্বাচিত প্রজাতি এ খামারে ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের মাছ সারা বছর বিক্রি করা হয়। ময়লা পানিতে উৎপাদিত মাছ পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ করে কলকাতা শহরে বাজারে পেতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। সামাজিকভাবে এই মাছ গ্রহণযোগ্য।

৩. পূর্ব কলিকাতা মৎস্যজীবী সমিতি

পূর্ব কলিকাতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ১২০ জন দরিদ্র সদস্যকে সংগঠিত করে ১৯৯০ সাল থেকে পূর্ব কলিকাতা উপনগরী এব। ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন ৪০ হেঃ নীচু জলাভূমিকে কলকাতা শহরের গার্হস্থ্য ময়লা পানি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। খামারের উল্টর ও দক্ষিণ দিকের খাল দিয়ে কলকাতা শহরের গার্হস্থ্য বর্জ্য পানির ব্যাপক অংশ উক্ত খামারে ঢুকিয়ে মাছের চাষ করা হচ্ছে। দৈনিক ২০ মিলিয়ন লিটার ময়লা পানি ১২০ একরের ৮৩টি পুকুরে সরবরাহ করা হচ্ছে। সমিতির বিগত ৩ বছরের উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সাল	মাছ উৎপাদন (কেজি)	বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা)	হেঃ প্রতি উৎপাদন (কেজি)
১৯৯৩-৯৪	৮৬,৫২১	১২.৫২	৩,০৩৩
১৯৯৪-৯৫	৬৫,৫৯৭	১০.৭৩	১,৯৫৮
১৯৯৫-৯৬	৭৮,২০০	১৬.৩৩	১,৯৭৬

সমিতির সদস্যদের মধ্যে ৫৪ জন দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে এই খামারে কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা। খামারের সকল পুকুরের পাড় এবং পাড়ে বিভিন্ন ধরনের ফুল/ফলের গাছ লাগানো হয়েছে। পুকুরের ময়লা পানি দিয়েই এসব চাষাবাদ চলছে। প্রতিবছর খামারটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে লোকজন এখানে বনভোজন করতে আসে। পাঁচটি পুকুরকে একত্রিত করে প্যাডেল বোট চালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোর বর্জ্য পানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। শহরের শুষ্ক বর্জ্য ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর আবাসিক এলাকা, নয়নাভিরাম অট্টালিকা, পার্ক।

ইদানিং জৈব সারও প্রস্তুত হচ্ছে। অথচ ময়লা পানির সঠিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। বিভিন্ন শহরের অশোধিত ময়লা পানি আমরা নির্দিধায় অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয়ে ফেলছি, নষ্ট করছি সেখানকার প্রাণীকুলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, হারিয়ে ফেলছি অনেক প্রজাতির জলজ প্রাণী। সম্পদ ঘাটতির এই দেশে সম্পদ উন্নয়নের সহায়ক এই বর্জ্য পানি আমাদের মাছ, শাকসবজি, ধান উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পরিবেশ দূষণের মারাত্মক মকি থেকে রেহাই দিতে পারে সমগ্র জীব কুলকে - প্রকৃতিকে।

বিষয়টি অনুধাবন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা প্রভাষক ডঃ এন. সি. দত্ত একটি প্রশিক্ষণে বলেন, "ময়লা পানি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ চাষ শুধু মাছ উৎপাদনের একটি পদক্ষেপ নয় - পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটি উৎকৃষ্ট পদক্ষেপও"।

প্রতি বিভাগীয় শহরে অন্ততঃ ১টি মাছ চাষের মাধ্যমে বর্জ্য পানি শোষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে অভিজ্ঞতা নেয়ার পর সকল শহরে তা করা যেতে পারে। কলকাতা শহরের অভিজ্ঞতা নেয়া আমাদের জন্য খুবই সহজসাধ্য। পরিবেশের স্বার্থে, পুষ্টির স্বার্থে, অর্থের তাগিদে, কর্মসংস্থানের তাগিদে এ লক্ষ্যে আমাদের আর দেরী করা উচিত নয় - যাতে করে পরবর্তী প্রজন্ম প্রশ্ন না করে - তোমরা নাকি দূষিত ময়লা পানি সরাসরি নদীতে ফেলে দিতে ?

মৎস্য খাতে ঋণ প্রদান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকৃতির অকৃপণ হাতে প্রদত্ত বিপুল জলভান্ডারে সমৃদ্ধ আমাদের এদেশ। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দীঘি মাছ চাষ বা আহরণের উত্তম ক্ষেত্র। এ দেশে এমন একটা সময় ছিল যখন নামমাত্র শ্রম আর পুঁজি বিনিয়োগ করলেই মাছ ধরা যেত। মাছের এ সহজলভ্যতা আর প্রাচুর্যের কারণেই আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ অন্যতম প্রধান খাদ্যের স্থান দখল করে আছে। ফলে অনাদিকাল থেকে আমরা 'মাছে ভাতে বাঙ্গালী'-রূপে পরিগণিত। আমাদের প্রাণিজ আমিষের যোগানে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ও কর্মসংস্থানে মাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালের বিবর্তনে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপে চাহিদা আর যোগানের মধ্যে ফারাক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে চাষীগণ 'দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের' মধ্যে আবদ্ধ। তাঁদের পুঁজির অভাবে বিনিয়োগ কম, ফলে উৎপাদন হতে আয় আরো কম। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বাধীনতাত্তোরকাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ, মৎস্য অধিদপ্তরের প্রেরণা ও পরামর্শের মাধ্যমে কৃষি ঋণের পাশাপাশি মৎস্য চাষের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ঋণ প্রদানের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচীর বিবরণ

মৎস্যখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচী চালু আছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ঋণ কর্মসূচীর বিবরণ প্রদান করা হলো।

ক. পুকুর মৎস্যচাষ ঋণদান কর্মসূচী

এই কার্যক্রমটি রাষ্ট্রয়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যথা- রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডও এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই ঋণ সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত এবং পরিচিত বিধায় এই ঋণের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

পুকুরের মালিক, ইজারাদার, যৌথ মালিকানাধীন পুকুরের অংশীদারগণ হতে আমোক্তারনামা (power of attorney) বা সম্মতি পত্র (letter of consent) প্রাপ্ত অংশীদারগণ আবেদনের যোগ্যতা রাখেন।

ঋণের আবেদনপত্র দাখিল

আগ্রহী প্রার্থীগণকে ব্যাংক শাখা/স্থানীয় থানা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস থেকে ঋণের আবেদনপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণের পর থানা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। থানা মৎস্য কর্মকর্তা আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুকুরের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং সরেজমিনে পুকুর তদন্ত শেষে কারিগরি সম্ভাব্যতা সন্তোষজনক হলে ও মালিকানা যথার্থ মনে হলে আবেদনপত্রে সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় পাঠাবেন।

ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ

ব্যাংকের কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে একক বা যৌথভাবে পুকুর পরিদর্শন করবেন।

ঋণ মঞ্জুরীর পর জামানত সংক্রান্ত এবং অন্যান্য চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ব্যাংক শাখা ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঋণ গ্রহীতার একটি তালিকা ঋণের তথ্যাবলীসহ ব্যাংক শাখা স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে, যেন থানা মৎস্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পুকুরগুলি যথাযথ তত্ত্বাবধানে রাখতে পারেন। যে সকল আবেদন বাতিল করা হবে তার তালিকা ও কারণসহ থানা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট ব্যাংক শাখা প্রেরণ করবে।

প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুরে ব্যাংক কোন কারণে অপারগ হলে ব্যাংক তাদের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে কারণসহ লিখিতভাবে জানাবে।

ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

এই ঋণের আওতায় ব্যাংক বিঘা প্রতি সর্বোচ্চ ১৭,২০০/- টাকা প্রদান করবে এবং সর্বোচ্চ ৩ বিঘা বিশিষ্ট পুকুরের জন্য ঋণ প্রদান করবে। এই ঋণের মধ্যে পুনঃ খননের জন্য ১৫,০০০/- ধরা আছে। যাদের পুকুর পুনঃখননের প্রয়োজন নাই তাদের জন্য ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় বিঘা প্রতি ২,২০০/-।

পুনঃখননকৃত পুকুরের ক্ষেত্রে ৩ কিস্তিতে এই অর্থ প্রদান করা হয়। প্রতি কিস্তির পর পরিদর্শন রিপোর্টের প্রয়োজন হয়। সকল ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের জামানত ও দলিলপত্র জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট অঙ্গীকারপত্র (ডি.পি. নোট) প্রদান এবং ব্যাংকের অনুকূলে পুকুরের মৎস্য বন্ধকীকরণ দলিল (hypothecation deed) সম্পাদন করতে হয়। অংগীকার পত্রের (ডি. পি. নোট) অর্পণ পত্র (delivery letter) জামানতের দ্বারা (যদি থাকে) স্বাক্ষর করাতে হবে। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত জামানত ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংক গ্রহণ করবে।

১. ঋণ গ্রহীতা নিজে পুকুরের মালিক হলে সহায়ক জামানত (co-sharer) হিসেবে সংশ্লিষ্ট পুকুরটির বন্ধকী দলিল ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি করে দিতে হবে। যদি পুকুরের মূল মালিকানা দলিল না থাকে তবে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধক হিসেবে প্রদান করবে।

২. ঋণ গ্রহীতা পুকুরের অংশীদার (co-sharer) হলে অবশিষ্ট সকল অংশীদার হতে আমমোক্তারনামা (power of attorney) অথবা তাদের সম্মতিপত্র (letter of consent) ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে তার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধিকৃত (registered) বন্ধকী হিসেবে প্রদান করতে হবে। ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত পুকুর বা জমি সকল প্রকার দায়মুক্ত বলে ঋণ গ্রহীতাকে ষ্টাম্প পেপারে একটি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে।

৩. ঋণ গ্রহীতা পুকুরের ইজারাদার হলে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ও যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মালিক (চেয়ারম্যান/মেম্বার/ডাক্তার/শিক্ষক)-এর নিকট থেকে ব্যক্তিগত পরিশোধ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৪. বন্ধকীকৃত জমির/পুকুরের মূল্য প্রচলিত বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

কৃষি ঋণ পাশ বহি

এই ঋণ কর্মসূচীর অধীনে 'কৃষি ঋণ পাশ বহি' -এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হবে।

সুদের হার

এই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বর্তমান সুদনীতি অনুযায়ী স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। খেলাপী (overdues) ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের পরের দিন থেকে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্ধারিত হারে দন্ড সুদ আদায় করবে।

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ

ঋণ বিতরণের ১৮ মাস পর সুদসহ পরিশোধ করতে হবে।

ঋণ ব্যবহারের তদারকী ও আদায়

ব্যাংক শাখা প্রদত্ত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। থানা মৎস্য কর্মকর্তা ঋণ গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদানপূর্বক ব্যাংক ঋণের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি নজর রাখবে এবং পরবর্তীতে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে ব্যাংক শাখাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ঋণ গ্রহীতা মৎস্য বিভাগ ও ব্যাংক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুকুরে পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করবে এবং মাছ ধরার তারিখেও উক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকবেন।

ঋণের আবেদনের সময়সীমা

এই ঋণের আবেদন বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হয়। নির্ধারিত সময়ের পর আবেদন গ্রহণ করা হয় না। যদিও মাছ চাষ সারা বছর ব্যাপীই হয়ে থাকে।

খ. মাছ চাষের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ ব্যবস্থা

মৎস্য চাষীগণকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক ঋণের পরিমাণ, বিতরণ খাত, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধের কিস্তি নির্ধারণ করে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত যারা বেশি অংকের ঋণের জন্য আবেদন করেন তারা এই ক্যাটাগরীর ঋণ পেয়ে থাকেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কাকে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তার হিসেব মৎস্য অধিদপ্তরকে জ্ঞাত করানো হয় না।

গ. সাধারণ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় পল্লী ঋণ

শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতী এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ পেয়ে থাকে। চাকুরীর অভাবে যাতে শিক্ষিত যুব সমাজ হতাশাগ্রস্থ না হয়, সে লক্ষ্যেই এই ঋণ ব্যবস্থা। ঋণ প্রদানের সাধারণ নিয়মাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক/যুবতী লেখাপড়া শেষ করে কোন চাকুরী পায়নি তারা এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ পাবার যোগ্য, তবে মৎস্যচাষের ওপর তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

ঋণ গ্রহণের জন্য গ্রুপ গঠনের প্রয়োজন হবে। ঋণ গ্রুপের নামে প্রদত্ত হবে।

যে সমস্ত পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে না, তা গ্রুপের নামে লীজ গ্রহণ করতে হবে। সরকারী পুকুর/বাওড় গ্রুপের নামে লীজ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঋণের জামানত

এ ঋণের জন্য কোন অতিরিক্ত জামানতের প্রয়োজন হবে না। তবে অভিভাবকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র প্রদান করতে হবে।

গ্রুপ সদস্যদের ব্যক্তিগত এবং দলগত নিশ্চয়তাপত্র প্রয়োজন হবে এবং উৎপাদিত মাছের ওপর বন্ধকি দলিল করতে হবে।

৫০,০০০/- টাকার বেশি ঋণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে সমপরিমাণ সহায়ক জামানতের প্রয়োজন হবে।

ঋণের পরিমাণ

পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় ব্যাংক ঋণ থেকে মিটানো হবে। ঋণ আবেদনকারীর গ্রুপ এবং ব্যাংক যৌথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে ঋণের পরিমাণ এবং ঋণের মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে। ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৫ বৎসর। ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একাধিক কিস্তিতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করা হবে । এ জাতীয় ঋণের সুদের হার ১৩%।

ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি

প্রতিবার মাছ ধরার সময় বিক্রিত মাছের মূল্যের ৫০% ঋণের হিসাবে জমা হবে, যতদিন না সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয়। বিক্রিত মাছের ৫০% টাকা গ্রুপ সদস্যরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুকুরের মাছ ধরা এবং বিক্রি হবে।

ঘ. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ প্রদান

ময়মনসিংহ মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প

এই প্রকল্পটি একটি পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রথম পর্যায়ে কেবলমাত্র ময়মনসিংহ জেলায় প্রকল্পটি সীমিত ছিল। দ্বিতীয় ধাপে এই প্রকল্পটি মোট ৬টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ঋণ প্রদানের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট আছে যা অন্যান্য প্রকল্পে নাই।

এই প্রকার ঋণ গ্রহীতাকে কোনরূপ জামানত দিতে হয় না। কারণ প্রকল্প থেকে মোট ঋণের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়।

চাষী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, মাছ অবমুক্তি, আহরণ, খাদ্য প্রদান ইত্যাদি প্রকল্পের দেশী/বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত তদারক করেন। প্রকল্প এলাকায় প্রতি থানায় অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে তদারকী করানো হয়। প্রকল্পের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মাছ বিক্রি করা হয়, ফলে অর্থ অদায় সহজ হয়।

প্রথম ধাপে প্রকল্প থেকে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭% ঋণ বিতরণ করা হয় এবং বিতরণকৃত ঋণের আদায় ৯৯%। অন্য কোন পদ্ধতি এতটা সফল প্রমাণিত হয়নি। তবে এই প্রকল্পের ব্যয় অত্যন্ত বেশি। যা কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের পক্ষে বহন করা লাভজনক হবে না।

ঙ. দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ

মৎস্য ও চিংড়ি চাষী এবং এই শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে পুঁজির যোগান প্রদানের উদ্দেশ্যে সারা দেশব্যাপী এক ব্যাপক কার্য্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থাণুকুল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কৃষি ব্যাংক,

রূপালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই কার্যক্রমের জন্য ১১৪৭০.০০ লক্ষ টাকা ৩টি ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণের জন্য নির্ধারিত ছিল। নিম্নে মোট অর্থের বিভাজন প্রদান করা হলো ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক ২৫২.০০ লক্ষ টাকা, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক সমূহ ৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা, মৎস্য চাষী ২২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৮২৫৯.০০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট ১১,৪৭০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী ২০ টি ঋণ মডেল দেশী/বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণয়ন পূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এই নিয়ম পালনপূর্বক ঋণ বিতরণ সম্ভব নয় বলে ব্যাংক মতামত জ্ঞাপন করে। এমনকি প্রথম দিকে উল্লেখ ছিল থানা মৎস্য কর্মকর্তার সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হবে। ব্যাংক তাতেও অসম্মতি জানায়। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পূর্ণ নিজের নিয়মেই ঋণ বিতরণ করে। মৎস্য অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা করা সত্বেও ঋণ বিতরণের পরিমাণ খুবই নগণ্য। নিম্নে ডিসেম্বর '৯৬ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের বিবরণ প্রদান করা হলো। অগ্রণী ব্যাংক ২৭৪৪.৮৫ লক্ষ, রূপালী ব্যাংক ৯৯৫.৩৫ লক্ষ, কৃষি ব্যাংক ২৪৮৭.৭৯ লক্ষ সহ সর্বমোট ৬,২২৭.৯৯ লক্ষ টাকা।

বিবিধ ঋণ

পূর্বে উল্লেখিত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক/অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান মৎস্য খাতে বিশেষ করে মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন ঋণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ঋণ, রপ্তানি ঋণ আদায় করে থাকে। ঋণের জন্য ব্যাংকের মূলধনের অভাব নাই। আসলে সমস্যা অন্যত্র নিহিত। ঋণ প্রদানের সমস্যা এবং সম্ভাবনার দ্বার উন্মেচনের নিমিত্তে সুপারিশ সমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১. যৌথ মালিকানাজনিত সমস্যা

বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরই যৌথ মালিকানাধীন। ফলে প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতাগণ সহায়ক জামানত হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি অথবা অন্য কোন সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট বন্ধক দিতে না পারার কারণে অনেকের পক্ষেই ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে চালু ঋণ পদ্ধতির পরিবর্তে একটি সহজ ঋণ বিতরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও চালু করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ক্রেডিট গ্যারান্টি ধরেও ঋণ বিতরণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মৎস্য বীমা চালু করা অবশ্যই প্রয়োজন হবে।

২. সুদের হার হ্রাসকরণ

বিভিন্ন প্রকল্প কিংবা বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন হারে ঋণের ওপর সুদ গ্রহণ করে থাকে। মৎস্য খাত যেহেতু শিল্প খাতে অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু মৎস্য ঋণের সুদের হার সবক্ষেত্রে শিল্প ঋণের সুদের হারের ন্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. মৎস্য ব্যাংক

মৎস্য খাত একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত। এ খাতকে আরও সম্ভাবনাময় করতে হলে পৃথক ঋণ বাজেটসহ একটি মৎস্য ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। যদি এখনই মৎস্য ব্যাংক স্থাপন করা না যায় তাহলে নিদেনপক্ষে প্রতি ব্যাংককে একটি মৎস্য সেল স্থাপন করে এই কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

৪. ঋণ প্রদানের সময়সীমা

আমাদের দেশে সারা বছর ব্যাপী মৎস্য চাষ করা সম্ভব। কাজেই কণ প্রদানের জন্য কোন সময়সীমা বেঁধে না দিয়ে বছরব্যাপী বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থা বহাল করা প্রয়োজন।

৫. ব্যাপক প্রচারণা

ব্যাংক ঋণ সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত নয়। ঋণ বিতরণ ও গ্রহণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন।

৬. ঋণ মঞ্জুরীর সময়সীমা নির্ধারণ

একটি আবেদন পাওয়ার সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণের বাধ্যতামূলক সময়সীমা থাকা প্রয়োজন। কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য না হলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারণসহ জানাতে হবে। অন্যথায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭. ব্যাংকারদের উৎসাহ প্রদান

দেখা গেছে মৎস্য ঋণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আবেদনকারী অল্প অর্থের জন্য আবেদন করেন। অথচ এর জন্য অনেক শ্রম দিতে হয়। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অল্প ঋণ প্রদানে উৎসাহ দেখায় না। অনেকক্ষেত্রে গড়িমসি বা হয়রানি করে মৎস্য চাষীগণকে নিরুৎসাহিত করেন। পক্ষান্তরে বৃহৎ অংকের ঋণ প্রদানে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখান। এরূপ ক্ষেত্রে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণের চেয়ে কত বেশি লোককে ঋণ বিতরণ করা হযছে এবং কত বেশি আদায় হয়েছে এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের আকর্ষণীয় পুরষ্কারের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮. নিয়মকানুন সহজীকরণ

আমাদের দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকজনের মৎস্য কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হলে ব্যাংক ঋণের নিয়মাচার সহজীকরণ করা অপরিহার্য। দিনের পর দিন ব্যাংকে ধর্ণা দিতে দিতে প্রকৃত ঋণের বৃহৎ অংশই চলে যায়। এর পরেও মরার ওপর খাড়ার ঘায়ের মত সুদের বোঝাতো আছেই। এ সমস্ত কারণে মানুষ উচ্চ সুদের মহাজনদের নিকট যায় কিন্তু তবুও ব্যাংকে যায় না।

৯. ঋণ বিতরণ পর্যবেক্ষণ

প্রতিটি ব্যাংকে যে পরিমাণ অর্থ মৎস্য ঋণের জন্য বরাদ্দ হয়, তা সঠিকভাবে বিতরণ হয়েছে কিনা? না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ? এবং আদায় অগ্রগতি ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত মনিটরিং ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকলে মৎস্য খাতে ঋণ প্রদান সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান করা সম্ভব এবং মৎস্য চাষের সম্ভাবনা তখন আরোও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের দর্শন ও কেইস ষ্টাডিজ

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
মোঃ সামছুল কবির
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর
মোঃ আব্দুর রহমান
কর্মসূচী সমন্বয়কারী (মৎস্য), প্রশিকা
এস.এম. নাজমুল আলম
প্রোগ্রাম অফিসার (মৎস্য), কারিতাস

সিবিএফএম প্রকল্পের পটভূমি

নদীমাতৃক বাংলাদেশ স্মরণাতীতকাল হতেই মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমান প্রায় ৪০.৪৮ লক্ষ হেক্টর । বিগত ষাট এবং সত্তর দশকে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যেত অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে । প্রাকৃতিক এবং মানুষের সৃষ্টি বিভিন্ন কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের গুনগত অবক্ষয় এবং হ্রাস পাওয়ার কারণে এ ক্ষেত্র হতে মৎস্য উৎপাদন গত তিন দশকে মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় । ফলে জনগণের খাদ্যে মৎস্য প্রাপ্তিতে এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । এমতাবস্থায় মুক্ত জলাশয় ও প্লাবভূমিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বে বাস্তবমুখী ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক ।

মৎস্য সম্পদ ও জলমহাল ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীর ইজারা প্রথা বিলোপ ঘটিয়ে সুফলভোগী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ই সালে বাংলাদেশ সরকার নয়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রবর্তন করে । এই নীতিমালার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক এবং ইকলার্ম এর কারিগরি সহায়তায় একটি পরীক্ষামূলক কারিগরি প্রকল্প (মুক্ত জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পরীক্ষামূলক প্রকল্প) গ্রহন করে । প্রকল্পটিতে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে (এন.জি.ও.) জড়িত করা হয় । এই প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প শীর্ষক একটি কারিগরি প্রকল্প গৃহিত হয় । প্রকল্পটিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন, আর্থিক এবং ইকলার্ম, কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে । বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, বাঁচতে শেখা, ক্রেড প্রকল্পভূক্ত জলাশয় মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে ।

সামজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কি ?

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বলতে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহনকে বুঝায় । মৎস্যজীবীরা তাদের জীবনযাত্রা উন্নত করার ক্ষমতা রাখে, তবে প্রয়োজন হলো তাদেরকে সংগঠিত হতে সাহায্য করা এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে করে তাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত কতে পারে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে । এ জন্যই সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রকল্প সহায়তা প্রয়োজন ।

জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মাছ ধরার অধিকার নিয়ম নির্ধারণে সরকারের মূখ্য দায়িত্ব রয়েছে । কিন্তু প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাছ ধরার নিয়ম কানুন পালনে বল প্রয়োগ তেমন কার্যকরী নাও হতে পারে অথবা কার্যকরী করতে অধিক সম্পদ প্রয়োজন । সুতরাং স্থানীয় সরকার ও সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সমন্বয়

সীমিত সম্পদের মাধ্যমে মৎস্য ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করা সম্ভব । যদি কোন জলমহালকে গ্রামবাসীরা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার করার সুযোগ পায় তাহলে তা সহনশীলভাবে ব্যবহার করতে তারা আগ্রহী হবে । মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং নীতি নির্ধারণে স্থানীয় প্রযুক্তির ব্যবহার করলে স্থানীয় জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে এবং তাদের প্রয়োজন মত ব্যবহারে সচেষ্ট হবে । মুক্ত জলাশয়ের জন্য সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাই একমাত্র ব্যবস্থাপনা নয় । আরও দু ধরনের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে পরিচিত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা এবং সবার মাছ ধরার অধিকার । কিন্তু এ ধরনের সম্পদ যেহেতু সবার মালিকানা সম্পদ এর অর্থ হলো অনেক লোকই এ সম্পদ ব্যবহার করে, তাই ব্যবহারকারীদেরও নির্দিষ্ট করা কঠিন এবং মাছ ধরার পর সবাই এটা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে । এ ধরণের অবস্থায় ব্যক্তি মালিকানায় অথবা সবার জন্য মাছ ধরার অধিকার এ দুটোতেই সমস্যা আছে । সবার জন্য মাছ ধরার অধিকার থাকায় বিভিন্ন দেশে মৎস্যজীবীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ফলে অতিমাত্রায় মাছ ধরা হচ্ছে । পরিশেষে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে মাছের পরিমান কমছে এবং মৎস্যজীবীদের ভরণ পোষনের উপায় নষ্ট হচ্ছে ।

ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটা রোধ করা সম্ভব । কারণ লীজগ্রহীতা নিজের প্রয়োজনেই তার ভবিষ্যত আয়কে সুনিশ্চিত করতে মাছ ধরার পরিমানের মাত্রা সীমিত করবে । কিন্তু আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য মাছ ধরার অধিকার সীমিত মাত্রায় করা খুবই কঠিন । স্বল্পমেয়াদী লীজের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত টাকা তোলা কঠিন হয় এবং তাৎক্ষণিক ভাবে মুনাফা পেতে চায় বলে কিছু মাছ রেখে দেয়ার চিন্তা করে না । ব সংখ্যক দরিদ্র মৎস্যজীবীকে সংগঠিত করে লীজের টাকা সংগ্রহ করা খুবই কঠিন । ধনী লোকরা লাভজনক জলমহালগুলি লীজ পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয় । কারণ এখান থেকে তারা বেশি পরিমাণ আয় করে এবং দরিদ্র জনগণ খুব স্বল্প পরিমান উপকার পায় ।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলসম্পদে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মৎস্য আহরণের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করবে । এ ক্ষেত্রে ধনী-গরীবের কোন বৈষম্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে নিয়ম কানুন নির্ধারণ করা হবে যাতে জনগণই মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ অনুসরন ও অনুশীলন করতে পারে । সাধারণত এ ধরণের ব্যবস্থাপনায় সমাজ কর্তৃক নির্দেশিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ব্যবস্থা কার্য্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার দর্শন

সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার সাফল্য নিম্নরুপ আশা করা যায় ঃ

১. মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিত্ব কার্য্যকরী পরিষদ জলাশয়ের দায়িত্বে ন্যাস্ত থাকবে ।

২. মৎস্যজীবী কর্তৃক প্রণীত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মৎস্য বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং জলসম্পদ ব্যবহারকারীরা সম্মত জ্ঞাপন করবে ।

৩. মৎস্যজীবী সমিতি দীর্ঘ মেয়াদে জলমহালের অধিকার স্বত্ব স্থাপিত করতে পারবে এবং মৎস্য অধিদপ্তর এর তদারকী দায়িত্বে থাকবে ।

৪. কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় প্রশাসন সুসংগঠিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের অধিকার স্বীকৃতি প্রদান করবে ।

৫. সুসংগঠিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, জল সম্পদ ব্যবহারকারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে মতবিরোধ সহজকরণে চুক্তিনামা সম্পাদিত হবে ।

৬. মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহের মান বর্ধন ও বৈচিত্রময় হবে ।

৭. স্বল্প সুদে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ পাবে ।

৮. মৎস্যজীবী সম্প্রদায় মৎস্য আবাসস্থল/বিচরণ ক্ষেত্র এবং মৎস্য মজুদ বৃদ্ধিকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে ।

সিবিএফএম প্রকল্পে'র মৎস্য ব্যবস্থাপনা মডেল

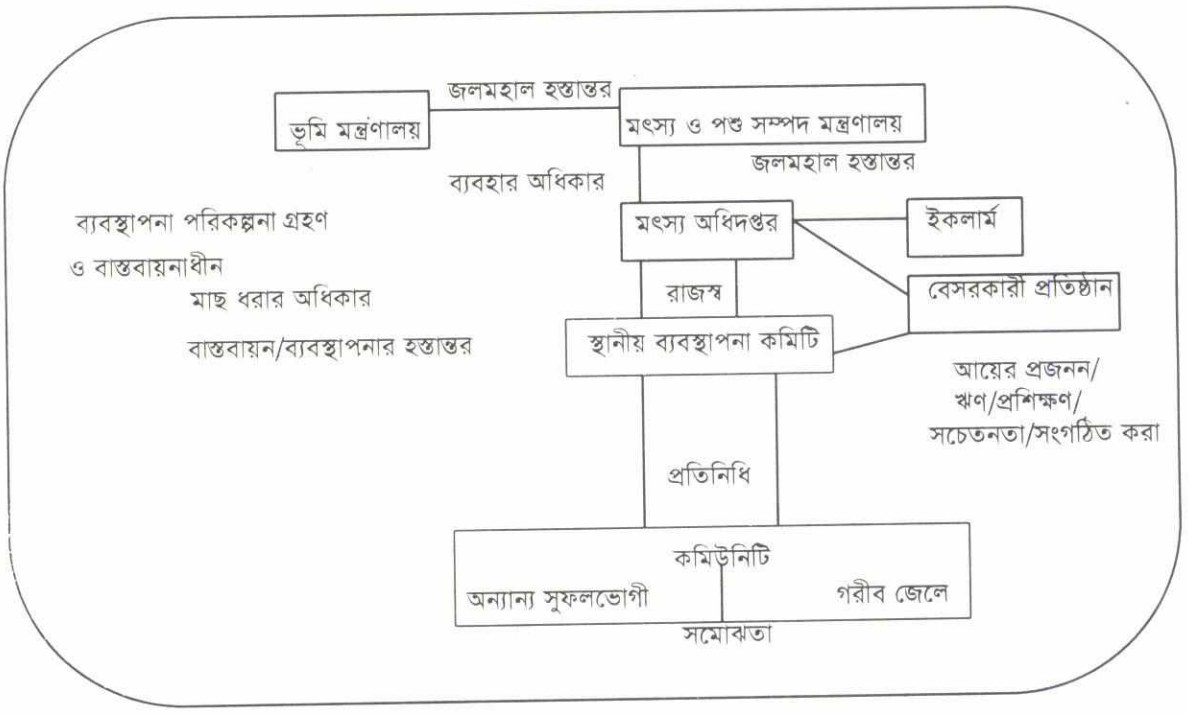

উপরোক্ত মৎস্য ব্যবস্থাপনার মডেল অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও জলমহাল ব্যস্থাপনার স্বার্থে সরাকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মকান্ড পরিচালনা করছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি কাঠামো উদ্ভাবন করা যা সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন এবং একই সাথে এদেশের মুক্ত জলাশয়ে ও প্লাবনভূমিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্য সম্পদ আহরণ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা । প্রকল্পটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে আরেকটি বিকল্প ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের বিষয়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য সুপারিশ রাখবে । প্রকল্পটির বাস্তাবায়নকাল ১লা জুলাই'১৯৯৫ তারিখ থেকে ৩০শে জুন'১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত । প্রকল্পের লক্ষ্য থাকবে ঃ-

১. মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সমন্বিত নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন ।

২. জলাশয় ব্যবহারে অধিকার এবং মৎস্য সম্পদ আহরণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ভুমিকা, চিরাচরিত ব্যবস্থা এবং বাস্তবিদ্যা (ইকোলজি) সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ।

৩. মৎস্য জলা ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা বিষয়ে বিকল্প ব্যবস্থা সমূহের তুলনামূলক কার্যকারিতা যাচাইকরণ এবং সামাজিক অংশীদারিত্বে উৎসাহিতকরণ, মৎস্য আহরণ চাপ হ্রাসকরণের বিষয়ে কর্মসূচী উদ্ভাবন ।

৪. প্রকল্পের আওতাধীন বিষয়সমূহে কারিগরী সহায়তা প্রদান, দিক নির্দেশনা ও জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা জোরদার করণ ।

প্রকল্পের সুফল দিক

১. উৎপাদন মূলক

বিভিন্ন জলমহালে এবং আহরণস্থলে একাধিক আহরণ উপযোগী মৎস্য সম্পদ এবং অন্যদিকে মৎস্য আহরণক্ষম চাপ সম্পর্কে উপযুক্ত সমীক্ষা না হওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদনের ভাসাম্যতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না । এ ছাড়াও বিভিন্ন জলমহালে মন্দার সময় এবং মৎস্য আহরণের ওপর চাপ হ্রাসে মৎস্যজীবীদের বিকল্প আয়ের উৎস নির্ধারণ না করা পর্যন্ত জলমহালে উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা সম্ভবপর নয় । এমতাবস্থায় প্রকল্পে সমাজ ও শ্রেণী ভিত্তিক অংশীদারি মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনকে সম্পদ ভিত্তিক রক্ষনাবেক্ষনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

২. আর্থ-কর্মসংস্থানমূলক

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন জনগোষ্টিকে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক উৎস হিসাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যেই সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এজন্য জলমহালের মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় উক্ত সংস্থাগুলো প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠের জন্য কল্যানমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাবে যেমন- বনায়ন, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগীর খামার প্রভৃতি । বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলা কর্মীদের সমন্বয়ে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সমন্বিত প্রকল্পে সম্পৃক্ত করা হবে । যথা- কুটির শিল্প, জাল, প্রস্তুত, হাঁস-মুরগীর খামার প্রভৃতি ।

সিবিএফএম প্রকল্পের জলমহাল

ক্রঃ	জলমহালের নাম	ধরণ	আয়তন (হেঃ)		থানা	জেলা	এন.জি.ও.
			বর্ষাকাল	শুষ্ক মৌসুম			
০১	কালি নদী	প্রবাহিত নদী	১২০০.০০	৮০০.০০	ভৈরব	কিশোরগঞ্জ	প্রশিকা
০২	তিতাস নদী (ক)	প্রবাহিত নদী	৩৯৭.০০	২৬৫.০০	বি-বাড়ীয়া	বি-বাড়ীয়া	প্রশিকা
০৩	তিতাস নদী (খ)	প্রবাহিত নদী	২১০.০০	১৮৩.০০	নবনগর	বি-বাড়ীয়া	প্রশিকা
০৪	বয়রালা নদী	প্রবাহিত নদী	২৮.০০	১৪.০০	মদন	নেত্রকোনা	প্রশিকা
০৫	মইশারকান্দি বোরনপুর	প্রবাহিত নদী	২০০.০০	৭৫.০০	মিঠামইন	কিশোগঞ্জ	প্রশিকা
০৬	ধলেশ্বরী নদী	প্রবাহিত নদী	৭১৭.০০	৬৬৬.০০	নাছিরনগর	বি-বাড়ীয়া	প্রশিকা
০৭	জারি যমুনা ও বাঁচামরা	প্রবাহিত নদী	৪১৬০.০০	৩০০০.০০	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ	প্রশিকা
০৮	তেঁতুলিয়া নদী	প্রবাহিত নদী	১৮০০০.০০	১৬৫০০.০০	ভোলা	ভোলা	প্রশিকা
০৯	আশুরার বিল	বিল	৫৫০.০০	২১.০০	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর	কারিতাস
১০	হামিল বিল	বিল	৩৮.০০	১৬.০০	মধুপুর	টাঙ্গাইল	কারিতাস
১১	উদ্দাখালী নদী	নদী	৮৭.০০	৬০.০০	কলমাকান্দা	নেত্রকোনা	কারিতাস
১২	রাজধলা বিল	বিল	৫০.০০	১৩.০০	পূর্বধলা	নেত্রকোনা	কারিতাস
১৩	দিগশী বিল	মৌসুমী বিল	২৩৪.০০	০০.০০	চাটমোহর	পাবনা	কারিতাস
১৪	গোয়াখোলা হাতিয়ারা	মৌসুমী বিল	২০০.০০	০০.০০	বাগারপাড়া	নড়াইল	বাঁচতে শিখা
১৫	আড়িয়াল খাঁ গংগাজিল	মৌসুমী নদী	১২৫.০০	৮০.০০	মনোহরদি	নরসিংদী	ক্রেড
১৬	নুরপুর হসিমদিয়া বিল	বিল	৮৪.২০	৬৪.৭৮	ভাংগা	ফরিদপুর	ব্র্যাক
১৭	সোনামাই নদী	নদী	২৬৩.১৬	২০২.৪৩	ভাংগা	ফরিদপুর	ব্র্যাক
১৮	চাপিহরিয়াগুয়া বিল	বিল	১৬৬.১৯	১২৭.৮৪	কানাইপুর	ফরিদপুর	ব্র্যাক
১৯	শিমুলিয়া বাওড়	বাওড়	৩১.৫৮	২৪.২৯	ঝিকরগাছা	যশোহর	ব্র্যাক
২০	কৃষ্ণচরনাপুর বাওড়	বাওড়	২৮.১৩	২১.৬৪	ঝিকরগাছা	যশোহর	ব্র্যাক
২১	বাগবতী নদী	নদী	১২৭.৮৩	৯৮.৩৩	ঝিনাইদাহ	ঝিনাইদাহ	ব্র্যাক
২২	রক্তাদাহ বিল	বিল	১৩৬.৮২	১০৫.২৬	আদমদীঘী	বগুড়া	ব্র্যাক

ক্রঃ	জলমহালের নাম	ধরণ	আয়তন (হেঃ)		থানা	জেলা	এন.জি.ও.
			বর্ষাকাল	শুষ্ক মৌসুম			
২৩	টিকরপাড়া	বাওড়	২৪.৪৩	১৮.৭৯	আলফাডাংগা	ফরিদপুর	ব্র্যাক
২৪	ধুম নদী	বিল	৭৫.৮৬	৫৮.৩৫	কাউনিয়া	রংপুর	ব্র্যাক
২৫	বিল সুতী	বিল	২১০.৫২	১৬১.৯৪	বাগমারা	রাজশাহী	ব্র্যাক
২৬	হারুডাংগা	বিল	২৫.০০	১৯.২৩	পিরগাছা	রংপুর	ব্র্যাক
২৭	রুহিয়া বাইশা বিল	বিল	৩৬.৮৪	২৮.৩৪	রংপুর সদর	রংপুর	ব্র্যাক

সিবিএফএম প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা ক্রেড কর্তৃক খাঁচায় মাছ চাষ

সিবিএফএম প্রকল্পের সহযোগি সংস্থা সেন্টার ফর রুরাল এন্ড এনভায়রনমেন্ট (ক্রেড) প্রকল্পভূক্ত আড়িয়াল খাঁ নদীতে ৮.০০ একর জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে খাঁচায় মাছ চাষ করে । খাঁচায় মাছ চাষের জন্য মৎস্যজীবী কর্তৃক পোনা মজুদ ও আহরিত মাছের পরিমান ও বিক্রয় লব্ধ টাকার পরিমান নীচে দেয়া হলো ঃ

নিম্নের স্বারণীতে মজুদকৃত পোনার সংখ্যা, মজুদের দিন, গড় দৈর্ঘ্য, গড় ওজন ও মোট ওজনের পরিমান দেয়া হলোঃ

প্রজাতি	মজুদের তারিখ	পোনা মাছের সংখ্যা	গড় দৈর্ঘ্য (সেঃ)	গড় ওজন (কে.জি.)	মোট ওজন (কে.জি.)
থাই সরপুঁটি	১০-০২-৯৭	৫,০০০	৭.০০	০.০১৬৬	৮৩.০০
কমন কার্প	১২-০২-৯৭	৭,০০০	৭.৫০	০.০১৭৫	১২২.০০
মিরর কার্প	১২-০২-৯৭	৬,০০০	৭.৫০	০.০১৭৫	১০৫.০০
সিলভার কার্প	১০-০২-৯৭	৮,০০০	৮.০০	০.০১৫৭	১২৫.৬০
রুই	১৭-০২-৯৭	৪,০০০	১০.০০	০.০১৮০	৭৩.৬০
মোট =		৩০,০০০	-	-	৫০৯.৭০

নিম্নে আহরণকৃত মাছের গড় দৈর্ঘ্য, গড় ওজন, মোট ওজন ও বিক্রয়লব্দ টাকার পরিমান দেয়া হলো ঃ

আহরনের তারিখ	থাই সরপুঁটি				কমন কার্প				মিরর কার্প			
	মাছের সংখ্যা	গড় দৈর্ঘ্য	গড় ওজন (কেজি)	মোট ওজন (কেজি)	মাছের সংখ্যা	গড় দৈর্ঘ্য	গড় ওজন (কেজি)	মোট ওজন (কেজি)	মাছের সংখ্যা	গড় দৈর্ঘ্য	গড় ওজন (কেজি)	মোট ওজন (কেজি)
১৫-৫-৯৭ইং	২,০০০	১৮.০০	০.৪৫০	৯০০	১,০০০	১৫.০০	০.২৫০	২৫০	২,০০০	১৫.০০	০.২৫০	৫০০
২০-৫-৯৭ইং	১,০০০	১৮.৫০	০.৪৬০	৪৬০	২,০০০	১৫.০০	০.২৫০	৫০০	২,০০০	১৫.০০	০.২৫০	৫০০
২৫-৫-৯৭ইং	১,৫০০	১৮.০০	০.৪৫০	৬৭৫	১,০০০	১৫.৫০	০.২৫৫	২৫৫	১,০০০	১৫.৪০	০.২৫৭	২৫৭
২৭-৫-৯৭ইং	-	-	-	-	১,৫০০	১৫.৪০	০.২৫০	৩৭৫	২০০	১৫.০০	০.২৫০	৫০
মোট =	-	-		২,০৩৫	-	-	-	১,৩৮০	-	-	-	১,৩০৭

আহরনকৃত মোট মাছের ওজন = ৪,৭২২ কেজি

মোট বিক্রিত টাকার পরিমান = ৪,৭২২ কেজী ৪০.০০ টাকা = ১,৮৮,৮৮০.০০ টাকা

ছোট মাছ বিক্রি = ৪০.০০ টাকা

= **১,৮৮,৯২০.০০ টাকা**

সিলভার কার্প ও রুই মাছ খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি । আহরনের সময় সিলভার কার্পের গড় ওজন ছিল ১৫০ গ্রাম ও রুই এর গড় ওজন ছিল ১৭৫ গ্রাম । তাই তারা ৯,০০০ সিলভার কার্প ও রুই ০৩টি পুকুরে পুনরায় মজুদ করেছে । প্যানে মৎস্যজীবীদের খরচ হয়েছিল ১,৩৪,০০০/- টাকা । মাছ বিক্রি করে আয় করেছে ১,৮৮,৯২০/- টাকা। তাদের নীট লাভ ৫৪,৯২০/- টাকা । ২৫ জন সদস্যের প্রত্যেকে লাভ পান ২,১৯৬.৮০ টাকা করে । তাছাড়া পুকুরে মজুদকৃত মাছ আহরন করার পর বিক্রি করে মৎস্যজীবীরা আরও লাভবান হবেন ।

প্রশিকার কর্মকান্ড

প্রশিকা ৮টি প্রবাহমান নদীতে সিবিএফএম প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ঃ-

১. সংগঠন তৈরী

৩৬৮টি সংগঠনে সদস্য সংখ্যা মৎস্যজীবী ২,১১৯ জন এবং ভূমিহীন ও প্রান্তিকচাষী ৪,৮১৭ জন মোট ৬,৯৩৬ জন । উক্ত সংগঠনের আওতায় ১৫,৩৬৫টি সমিতির সভা, ১,৩১৫টি সমাজের সভা এবং ৫৫টি র‍্যালী করা হয় ।

২. প্রশিক্ষণ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৪২৪টি মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষন ২,৫৩৫ জন মৎস্যজীবী এবং ৫,৪০৩ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী অংশগ্রহণ করে । তাছাড়া ২০০টি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,৭২৯ জন মৎস্যজীবী এবং ৪,৩৪১ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী অংশ গ্রহণ করে ।

৩. আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি

বিভিন্ন প্রকারের ৯২০টি আয় ও কর্মসংস্থান প্রকল্পে (যেমন- জাল, নৌকা, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, জাল বুনন, পরিবেশসম্মত কৃষি, মাছ ধরা, গরু মোটা তাজাকরণ, ইত্যাদি) ৪,৭১৪ জন মৎস্যজীবী এবং ১৫,৫৫৯১ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিকচাষী মোট ৫,৪১,৬৬,৩২৮.০০ টাকার ঋণ গ্রহণ করে ।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও প্রশিকা উক্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য অবকাঠামো বিনির্মাণ, বয়স্ক শিক্ষা, স্যানিটেশন ও নলকূপ বিতরণ এবং গৃহায়ন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে ।

কারিতাসের কার্যক্রম

দল গঠিত হওয়ার পরে সদস্য/সদস্যাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতা আনায়ণ এবং দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলীয় সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্নমূখী প্রশিক্ষণের (যেমন- মৌলিক, নেতৃত্ব, হিসাব রক্ষা, কারিরি) ব্যবস্থা করা হয় । সংগঠিত দল সমূহের ১,৫৭১ জন সদস্য/সদস্যাকে ৫৮টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ পর্যন্ত গঠিত ৪৪টি মৎস্যজীবী দলের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১,৪২,৫২৩ টাকা এবং ১২টি মহিলা দলের সঞ্চয় ৩৯,৫৭৯ টাকা ।

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে দলীয় সদস্যরা সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ এবং নিজেদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মৎস্য ও অমৎস্য বিষয়ক কাজে নিজেদের অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে । পাশাপাশি মন্দা সময়েও বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৭৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৬৬৩,০০০ টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের হার ৯৫% । কারিতাসের আওতায় উল্লেখিত ৫টি জলমহালের মধ্যে হামিল বিলে মৎস্যজীবীগণ নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধমে বিলে পোনা মজুদ করে । বিলের পাহারা, মৎস্য আহরণ এবং তা থেকে আয়ের প্রকৃত বন্টনের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ সামাজিক কার্যক্রমে নিজেদের অবদান রাখার মত বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে । ১৯৯৬'র মে সনে বিলের মৎস্যজীবীগন ৬২,০৭৮টি বিভিন্ন আকারের (১০-১৭ সেঃমিঃ) কার্প জাতীয় পোনা ১৬ হেক্টর বিশিষ্ট উক্ত বিলে মজুদ করে । এতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৪৪,৭১২.০০ টাকা । ১৯৯৭'র জানুয়ারী মাসে উৎপাদিত এর্ব আহরণকৃত মাছ থেকে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৪৫,৪১৩.০০ টাকা যা অতীতে বিলে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে । মজুদকৃত পোনা থেকে উৎপাদিত মাছের হেক্টর প্রতি উৎপাদন দাঁড়ায় ১,১১২ কেজি । এতে মৎস্যজীবী প্রতি নীট আয় দাঁড়ায় ৪,৯৪৩.০০ টাকা ।

গত বছরের অভূতপূর্ব সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে মৎস্যজীবীগন এ বছরও পোনা মজুদ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং এ পর্যন্ত ৮২,০০০টি কার্প জাতীয় পোনা মজুদ করে । অনুরূপভাবে আশুরার বিলের মৎস্যজীবীরা প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিলে অবস্থিত ''বুড়ির দহকে'' মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । ইতোমধ্যে উক্ত বিল থেকে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ উপকারভোগীরা ভোগ করতে শুরু করেছে ।

ব্র্যাকের কর্মকান্ড

ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জলমহাল হস্তান্তরের জটিলতার কারণে ব্র্যাক ১৯৯৭'র মে মাস হতে হস্তান্তরিত ০৫টি জলমহালে কাজ আরম্ভ করেছে । প্রাথমিক পর্যায়ে দল গঠনের কাজ শুরু হয় । ১৯৯৭'র নভেম্বর হতে জলমহালে বেইজ লাইন সার্ভে, ও মনিটরিং কার্যক্রম শুরু হবে ।

কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
এস, এ, শামীম আহ্মাদ
গবেষণা কর্মকর্তা
মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি দরিদ্র , নিম্ন আয় ও ঘনবসতি পূর্ণ দেশ। এ দেশে দারিদ্র সীমার নীচে জীবন যাপনকারী জনগোষ্ঠীর শতকরা হার প্রায় ৪৫। এদেশের ১১১.৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক বাস করে গ্রামীণ এলাকায়। বাংলাদেশের গ্রামীন এলাকার মূল বৈশিষ্ট্য হলো ভূমিহীনদের আধিক্য, নিম্ন আয়, বেকারত্ব এবং যার ফলশ্রুতি দারিদ্র্যতার চরমতা। দারিদ্র্যের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে বির্তক থাকলেও বাংলাদেশ যে অত্যন্ত দরিদ্র দেশ তাতে ভিন্নমত পোষন করার কোন অবকাশ নাই। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব নানা প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মাথাপিছু আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ সীমিত ও স্বল্প পরিমান ভূমি থেকে শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশুপাখি পালনের মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা খুবই কম। অপরদিকে এদেশ জলসম্পদে খুবই সম্পদশালী। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও নদ-নদী - যা কৃষিভূমির তুলনায় মাথাপিছু জলাভূমির পরিমান বেশী। আর তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে জাতীয় আয়, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও পুষ্টি সরবরাহে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৯৫-১৯৯৬ আর্থিক বছরে জিডিপিতে প্রায় ৪.৭% এবং রপ্তানি আয়ে ১২% ছিল মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের অবদান। তাছাড়া প্রাণিজ আমিষ চাহিদা পূরনে প্রায় ৬০% (মোট আমিষ চাহিদা পূরনে ৬%), মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ১০% এবং প্রত্যক্ষভাবে ১.৪ মিলিয়ন এবং পরোক্ষভাবে ১১.০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী মৎস্যখাতের উপর নির্ভরশীল।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (৫% এর বেশী) দৃশ্যত ইতিবাচক হলেও বিবিধ সামাজিক অসুবিধার জন্য এবং বাস্তব পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী বিশেষত স্বল্প আয়ের জনগণ সামগ্রিক ভাবে এ সুফল হতে বঞ্চিত। এর প্রধান কারণ হলো দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগণের স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাব। সে কারণেই দরিদ্র জনগণ 'দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের' মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। উন্নয়নের সুফল সুষম বন্টনের লক্ষ্যে নিম্নতম আয়ের দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের উপযুক্ত ও তাদের সাধ্যের মধ্যে সহজলভ্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ণে উপযুক্ত, টেকসই ও যথাযথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জন গোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সেক্টরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

মুষ্টিমেয় কয়েকটি খাত ব্যতীত সরকারী সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিই দেশের উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত। তবে নিম্ন আয়ের বিত্তহীন, দুস্থ মহিলা, বেকার যুবক এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক সরকারী কার্যক্রম ও প্রকল্প গুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কৃষি অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্যান্য অধিদপ্তর গুলোও দারিদ্র বিমোচনে ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচির মধ্যে মৎস্য সেক্টরে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির ভূমিকা অন্যতম। কেননা কোন খাত বা ক্ষেত্রের উৎপাদন এবং সেবার পরিমাণ নির্ভর করে সে খাতের সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগের ওপর এবং উৎপাদন ও সেবার মান বাড়াতে হলে প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ।

মৎস্য সম্পদের মধ্যে ২,৯৭,৪০৪ হেক্টর বদ্ধজলাশয় , ৪০,৪৮,৫৩২ হেক্টর মুক্ত জলাশয়, ১,৬৬,০৭,০০০ হেক্টর সামুদ্রিক জলসম্পদ-যা থেকে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ১২.৬৪ লক্ষ মেঃ টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন ও আহরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে প্রায় ১৩৪০.৯ মিলিয়ন টাকা। তাছাড়া এক হিসেবে অনুমান করা হয়েছে মৎস্য খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমানে পূর্নকালীন প্রায় ১৯.৩০ লক্ষ এবং খন্ডকালীন ৩০.০০ লক্ষ কর্মী নিয়োজিত আছে এবং উক্ত সেক্টরে আগামী ১৫ বছরে আরও অতিরিক্ত প্রায় ১৮.৪৬ লক্ষ পূর্নকালীন এবং ২৭.৬৮ লক্ষ খন্ডকালীন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও বর্ধিতহারে আমিষ যোগানের উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত এক দশকে বিশেরও অধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসর হতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ' **সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন** ' নামক সম্পূর্ন ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

দেশের ভূমিহীন গরীব কৃষক/মৎস্যচাষী/ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আয়বর্ধক উন্নত বা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় জামানত না থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পাবার সুযোগ হতে এরা বঞ্চিত। এসব দরিদ্র জনগণকে সমন্বিত মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী

ক. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত মৎস্যচাষের উপযোগী অব্যব ত জলাশয়ে গ্রামীণ বিত্তহীন, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাদের সম্পৃক্ত করে মৎস্য চাষ এবং একই সাথে হাঁস মুরগী, গরু ছাগল পালন, শাক সবজি/তরিতরকারী উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. হাজা-মজা খাসপুকুর/ দীঘি, ভরাট হয়ে যাওয়া মরা নদী, খাল বিল,হাওড়-বাওড়, বরোপিট, ডোবা-নালা ইত্যাদি উন্নয়ন/সংস্কার এর মাধ্যমে পতিত জলাশয় মাছচাষের আওতায় আনা।

গ. উন্নয়নকৃত বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয়সমুহ লক্ষ্যজনগোষ্ঠীর (Target group) অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যচাষ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

ঘ. জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশের উন্নয়ণ।

ঙ. জলাশয় উন্নয়ণ ও মৎস্য চাষ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য সুফলভোগীদের মুলধন গঠন।

প্রকল্পের জন্য সুফলভোগী নির্বাচন

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদেরকে সংগঠিত করে প্রতি একর জলাশয়ের জন্য কম বেশী ১০ জনের সুফলভোগীগ্রুপ গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ণ করা হয়। প্রতিটি সুফলভোগী গ্রুপের জন্য তাদের মধ্য থেকে ১জন দলপতি ও ১ জন সচিব নির্বাচন করা হয়। থানা পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রধান (নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) এর সভাপতিত্বে স্থানীয় কর্মকর্তা এবং সুফলভোগী গ্রুপ ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত **প্রকল্প কমিটি** সুফলভোগী গ্রুপ নির্বাচন, প্রযুক্তি প্যাকেজ ভিত্তিক মৎস্যচাষ পরিকল্পনা, প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ণ ও তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকে।

প্রতিটি সুফলভোগী গ্রুপ সরকারী / আধাসরকারী পুকুর, দীঘি, খালবিল , হাওড়-বাওড়, ডোবা - নালা, বরোপিট এবং বেসরকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয় লীজ গ্রহনের মাধ্যমে প্রযুক্তি প্যাকেজ ভিত্তিক মাছচাষ ও সম্ভাব্য পশুপাখি পালন/ঘাসচাষ/শাক সবজি চাষ/বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত ২/১ টি প্রযুক্তি প্যাকেজ কর্মসূচী সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করে

থাকে। গ্রুপের প্রতিটি সদস্যকে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এবং বাস্তবায়নকালে ৫ (পাঁচ) দিনের হাতেকলমে প্রশিক্ষণসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় জলাশয় স্বল্প সংস্কার ও ইজারার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য একর প্রতি ৩০,০০০/- টাকা এবং উৎপাদন উপকরণ বাবদ ২৭,০০০/- টাকা সিড ক্যাপিটাল/চলতি মূলধন হিসাবে দেওয়া হয়। উক্ত সিড ক্যাপিটাল সুফলভোগীগণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাজে ব্যয় করার পর উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়লব্দ অর্থ তাদের ব্যাংক একাউন্টে আবর্তক মূলধন হিসাবে জমা করে এবং লভ্যাংশ গ্রুপ সদস্যগণ ভাগ করে নেয়। উক্ত আবর্তক মুলধন হতে অর্থ তারা পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করে থাকে। এভাবে গ্রুপ সদস্যদের অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থাসহ স্থায়ীভাবে মূলধন গঠন হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত ৬৪ টি জেলার ৪৫৬ থানায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ২৮৩৫ একর হাজা মজা পুকুর , ভরাট হয়ে যাওয়া দীঘি ও সেচ প্রকল্প এলাকার জলাশয় ইত্যাদি সংস্কার / উন্নয়ণ করে প্রকল্প শেষে প্রতিবছর ২৮৩৫ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, শাক-সবজির চাষ ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পাবে এবং এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২৮৩৫০ জন সুফলভোগীর কর্মসংস্থান হবে। প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৩৯৩ টি থানায় ৫৫৫ টি গ্রুপের মাধ্যমে ৬৫৯.৭০ একর জলাশয়ে সমন্বিত মাছ চাষের মাধ্যমে ৬৭৩৪ জন সুফলভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্প শুরুর বছরেই সারা দেশে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছে সে প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ণে এ ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখা এবং বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

হামিল বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা

মোঃ আবদুল খালেক
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
টাংগাইল।

ভূমিকা

হামিল বিল টাংগাইল জেলার মধুপুর থানার ধনবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী একটি বিল। মূলত যমুনার শাখা বৈরাণ নদী এবং বংশাই নদীর মিলনস্থল। সময়ের বিবর্তনে নদীটির অস্তিত্ব বিলুপ্তি হলেও এর অশ্বখুরাকৃতি গভীর খাদটি হামিল বিল নামে সমাজে পরিচিত। মধুপুর সদর থেকে ১৭ কিঃ মিঃ অদূরে জামালপুর জেলার সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে অবস্থিত বিলাসপুর, বেলুটিয়া, রামকৃষ্ণবাড়ী, গোবিন্দচরন, নলহারা এ পাঁচটি গ্রামের সঙ্গমস্থলে বিলটি জন্ম লাভ করেছে। বিলটির আয়তন ৩৯.৫৭ একর বা ১৬.০২ হেক্টর। সারা বছর বিলটিতে পানি থাকে। শুষ্ক মৌসুমেও এতে এক মিটারেরও বেশী পানি থাকে। আর তাই বিলটি মাছ চাষে উপযোগী।

১৯৯৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হামিল বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়। সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বলতে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনগনের সক্রিয় অংশ গ্রহণকে বুঝায়। প্রকল্পটিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আর্থিক এবং ইকলার্ম কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। বেসরকারী সংস্থা কারিতাস হামিল বিলে মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ করছে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরুষ সদস্য নিয়ে ৬টি এবং মহিলা সদস্য নিয়ে ১টি মোট ৭টি মৎস্যজীবী দল গঠন করে। সতরজন মহিলাসহ দলের সদস্য সংখ্যা ১৫৪ জন। কারিতাস দলভূক্ত সদস্যদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি, বয়স্ক নিরক্ষতা দূরীকরণ, হাঁস মুরগীর রোগের প্রতিষেধক প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ১৯৯৬ সালে হামিল বিলে ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি আকারের রুই জাতীয় ৭টি প্রজাতির মোট ২৬,৯০৬টি পোনা ছাড়া হয়েছে। যার ক্রয় মূল্য ছিল ৪৪,৭১২/-।

মৌসুমান্তে মজুতকৃত মাছের বিক্রয়লব্দ আয় হয় ৬,৭১,৯৭৮/-। অমজুতকৃত আহরিত মাছ (যেমন আইর, বোয়াল প্রভৃতি) থেকে আয় হয় ৭৩,৪৩৫/-। অর্থাৎ একটি চাষ মৌসুমে টাঃ৭,৪৫,৪১৩/- আয় হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে হেঃ প্রতি ১৩৩ কেজি, ১৯৯৪-৯৫ সনে ২০৫ কেজি উৎপাদিত হয় সেখানে ১৯৯৬-৯৭ সালে ১,২৫৬ কেজিতে উন্নিত হয়। সারণি - ১ এ ১৯৯৬ সালে মজুতকৃত পোনা ও আহরিত মাছের বিবরণী সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

সারণি - ১ ঃ ১৯৯৬ সালে মজুতকৃত পোনা ও আহরিত মাছের বিবরণী

প্রজাতি	মজুদ		আহরিত	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
কাতলা	২১,৫৬৪ (টাঃ১১,৪৩৫)	৩৫	৮৭৩২ (টাঃ২৫০২৮৯)	৩২
রুই	১৪,১২৪ (টাঃ১৪৮৮০)	২৩	৭২৫৯ (টাঃ১২৪৩৮০)	২৭
মৃগেল	৮,৮৬৫ (টাঃ৭১২)	১৪	৬৮৯ (টাঃ১৭২০৮২)	২৬
গ্রাস কার্প	৭,৬৪০ (টাঃ৪৫১২)	১২	১২০২ (টাঃ৩৫৩৫৯)	০৪
সিলভার কার্প	৮,১৫০ (টাঃ৫২৪০)	১৩	১৫৭ (টাঃ৫১৫০৪)	০৬
কার্পিও	১,৩৮৫ (টাঃ১১১৮)	০২	৯৯৩ (টাঃ২২৮১৫)	০৪
মিরর কার্প	৩৫০ (টাঃ৩৫৫)	০১	২৫৬ (টাঃ১৫৫৪০)	০১
মোট	৬,২০,৮৭৮ (টাঃ৪৪৭১২)	১০০	২৬,৯০৬ (টাঃ৬৭১৯৭৮)	১০০

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে সমৃদ্ধ এদেশে রয়েছে ১.১৪ লক্ষ হেক্টর বিল, যাদের গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৫১১ কেজি। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এ সব বিলের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর সে উদ্দেশ্যেই এ লক্ষ্য সামনে রেখে বিলের তীরবর্তী মৎস্যজীবীদেরকে সংগঠিত করে ১৯৯৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হামিল বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়।

হামিল বিলের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত মৎস্যজীবীদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা এক বছরের কর্মকান্ড মূল্যায়ণ করে নিরুপণ করা অত্যন্ত দূরুহ কাজ। তবে অধিকতর মৎস্য উৎপাদন, অধিকতর মুনাফা অর্জন, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, ঋণমুক্ত জীবনযাপন ইত্যাদি মৎস্যজীবীদের মান উন্নয়নের বহিঃ প্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়।

কার্যক্রম

- উন্নত মৎস্য পোনা সংগ্রহে এবং মজুদকল্পে বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং কর্মরত এনজিওকে সর্বাধিক সহযোগিতা প্রদান।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং অবৈধ মাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ।
- থানা ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ সহযোগিতায় অবৈধভাবে লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে বিলের পানি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ এবং পাম্প ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সুফলভোগীদের আধুনিক বিল ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরণে গত মৎস্য পক্ষের কর্মসূচিতে স্থানীয় প্রশাসন সহ হামিল বিল পাড় সংলগ্ন মৎস্যজীবী জমায়েত এবং আলোচনা অনুষ্ঠান।
- মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণে সুফলভোগীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- হামিল বিলের বাৎসরিক ইজারা মূল্য (টাকা ২৬৬২৫/-) যথাসময়ে সংগ্রহ এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান।
- খাদ্যভোগ এবং মৎস্য ভক্ষণ সংক্রান্ত মনিটরিং জরিপ সাফল্যজনকভাবে অব্যাহত।

বেসরকারি সংস্থার (কারিতাস) কার্যক্রম ও সাফল্য

হামিল বিল ব্যবস্থাপনায় ১৯৯২ সাল থেকে কারিতাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে ১৯৯৬ সালের ১০ই অক্টোবর মৎস্য অধিদপ্তরের সংগে কারিতাস সমাজ ভিত্তিক অভান্তরীণ উন্মুক্ত মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যকর করার লক্ষ্যে স্মারক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়।

এই চুক্তি সম্পাদনার ফলে মাঠ-পর্যায়ের কর্মকান্ডে অধিকতর প্রাণ সঞ্চারিত হয়। হামিল বিলে কারিতাসের একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্যজীবী দলগঠনে ইতোমধ্যে সাফল্য অর্জিত হয়। দলভূক্ত মৎস্যজীবীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন মেয়াদী ৭টি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সাফল্য

- সমাজ-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ছয়টি পুরুষ ও একটি মহিলা মৎস্যজীবী দল গঠন।
- মৎস্যজীবী দলের সঞ্চয় বৃদ্ধি।
- পূর্বেকার তুলনায় রেকর্ড সংখ্যক মৎস্য উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি।
- মৎস্যজীবীদের সামাজিক উন্নয়ন।
- মৎস্যজীবীদের চিত্তবিনোদন ও সভা সমিতি অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিলের পাড়ে গোবিন্দচরন মৌজায় ১০ শতাংশ জমি ক্রয়।

সমস্যা

- ভূমি জরিপ ও স্থানীয় অফিস কর্তৃক নীতি বহির্ভূতভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের জন্য বিলের জমি পত্তনে পায়তারা।
- শুকনো মৌসুমে কৃষি বা অন্যান্য কাজে বিল থেকে অবৈধভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের পানি সেচের ফলে বিলের পানি আশংকাজনকভাবে হ্রাসের সম্ভাবনা।
- বিল ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু সরকারী নীতিমালার অভাবে রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক অবৈধভাবে বিল দখলের তৎপরতা বৃদ্ধি।
- বিল সংলগ্ন কোন নার্সারী প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সময়মত বড় আকারের পোনা সংগ্রহ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং পোনার ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পায়।

সম্ভাব্য সমাধান

- সরকারী/বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও.) প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন পূর্বক বিল পত্তনীয় বিষয়টি তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং নিষ্পত্তির তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য।
- শুষ্ক মৌসুমে বিলের পাড়ে শ্যালো মেশিনে পানি সেচ না দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কৃষক ও মৎস্যজীবীরা উভয়ই যাতে বিলের পানি ব্যবহার করতে পারে, সে জন্য সমযোতায় উপনীত হওয়া।
- বিল ব্যবস্থাপনায় সরকারীভাবে রাজস্ব বিভাগের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করা একান্তই প্রয়োজন। রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক জরীপের মাধ্যমে বিলের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ এবং নিরূপন করতঃ সুফল ভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা।
- বড় আকারের এবং সময়মতো পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকরণে বিলে পেন এর মাধ্যমে নার্সারী পুকুর প্রস্তুত করা।
- বিলের উত্তর পূর্ব দিকে যে নালা রয়েছে সেখানে স্লুইস গেইট নির্মাণের ব্যবস্থা করা।
- বছরান্তে ১০% বাড়তি ইজারা মূল্য রহিতের গ্রহণ করা দরকার।

হামিল বিলে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ইতিহাস আমাদের দেশে খুব বেশী দিনের নয়। লীজের মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তি জলাশয়ের কর্তৃত্ব করতঃ মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব হয়ে ওঠে। ফলে পারিবারিক অর্থনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে অনেকে প্রকৃত পেশা ত্যাগ করে বিকল্প পেশা খুঁজে নেয়। এমন পরিস্থিতি উত্তরণে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প হামিল বিলসহ কতিপয় মুক্ত জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও সময়োপযোগী কার্যক্রমের মাধ্যমে সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। হামিল বিল ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান দিকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- হামিল বিল ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত মৎস্যজীবী।
- পুরুষ সদস্য নিয়ে ছয়টি এবং মহিলা সদস্য নিয়ে একটি মৎস্যজীবী সমিতি গঠন করা হয়েছে।
- প্রত্যেকটি সমিতি একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহ-সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ এবং সমিতি ভূক্ত বাদবাকী সদস্যগণ কার্যকরী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
- গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিটি গ্রুপ থেকে তিন জন মৎস্যজীবী নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।
- প্রতি বছর মৎস্য চাষ মৌসুমের পুর্বে পোনা ক্রয়ের নিমিত্তে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে এবং প্রত্যেক সমিতির প্রত্যেক সদস্যগণ একশত টাকা প্রদান করে। কারিতাসের দেয় ঋণ ১২% সার্ভিস চার্জ সহ মাছ ধরার মৌসুম শেষে ফেরৎ প্রদান করা হয়।
- সাধারণত ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি আকারের চেয়ে ছোট পোনাও মজুদ করতে হয়।
- সমিতিভূক্ত মৎস্যজীবীগণ পালাক্রমে বিলের পাহাড়ায় নিয়োজিত থাকেন।
- সমিতির সদস্যবর্গ নিজেরাই নিজেদের জাল দিয়ে মাছ আহরণ করেন এবং বিলের পাড়ে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।
- বিক্রি লব্দ অর্থ সকল সদস্যের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা হয়।

হামিল বিল ব্যবস্থাপনা সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলছে। হামিল বিল ব্যবস্থাপনা অন্যান্য বিলের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে পারে। তবে এই বিলের কার্যক্রম যথাযথ ভাবে মূল্যায়ণে ভুলত্রুটি সংশোধন পূর্বক এবং প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতঃ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাছের খাবার তৈরি ও ব্যবহার পদ্ধতি

ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দীন
উপ প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর

ভূমিকা

কৃষি নির্ভর এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় প্রাণিজ আমিষ চাহিদা পূরণে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান বর্তমানে শুধু তাৎপর্যপূর্ণই নয়, এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ, রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ এবং প্রাণিজ আষিষের শতকরা ৬০ ভাগ আসে মৎস্য সম্পদ থেকে। প্রায় ১২ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে এবং এক কোটি লোক তাদের জীবিকা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত আছে। এত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ ১৯৯৫ সালে ১৮ গ্রামে এসে দাঁড়িয়েছে। যা কিনা ১৯৬২ সালে ছিল ৩৩ গ্রাম। তাই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির মুখে নূন্যতম মাছ তুলে দিতে হলে মাছের বর্তমান উৎপাদন ব লাংশে বাড়াতে হবে। আর এ বর্ধিত মাছ উৎপাদন করতে হলে যেমন-আধুনিক চাষ পদ্ধতির প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মাছকে পরিমিত সুষম খাবার প্রদান করা।

সুষম ও সম্পূরক খাদ্য কি এবং কেন

অন্যান্য প্রাণীর মতই মাছকেও বেঁচে থাকা এবং দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ পুকুরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করেই মাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে, দ্রুত বৃদ্ধি এবং অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্যে প্রাকৃতিক খাবারই যথেষ্ট নয়। এছাড়া পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির জন্যে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করেও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। সুষম খাবার মাছের দেহবৃদ্ধি তরান্বিত করে অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ করে আর সর্বোপরি চাষকৃত মাছের মধ্যে সগোত্রীয় ভোজন প্রতিরোধ করে। তাছাড়া সুষম খাদ্য ব্যবহারের ফলে জৈবিক উচ্ছিষ্ট অংশের দ্বারা অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা যায় যা পরবর্তীতে মৎস্য চাষীর মুনাফার হার বৃদ্ধি করে। সুতরাং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুষম ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ এক কথায় অপরিহার্য। নীচের বিশ্লেষণ থেকে এ বিষয়ে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ১ ঃ সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের প্রাপ্ত উৎপাদনের একটি তুলনামূলক বিবরণ।

বিবেচ্য সমূহ	সম্পূরক খাদ্যবিহীন সনাতন পদ্ধতির চাষ	সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগসহ উন্নত পদ্ধতির চাষ
পুকুরের আয়তন (একর)	১	১
উৎপাদন (কেজি/বছর)	৩০০	২,০০০
বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	১৫,০০০	১,০০,০০০
ব্যবস্থাপনা খরচ (পুকুর তৈরী,পোনা ইত্যাদি)	৫,০০০	১০,০০০
সম্পূরক খাদ্য	-	৬৪,০০০
মুনাফা	১০,০০০	২৬,০০০

উৎস ঃ সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিমিটেড

মাছের পুষ্টি চাহিদা

সুষম খাদ্য তৈরীর পূর্ব শর্ত হলো কোন মাছের পুষ্টি চাহিদা কতটুকু তা জেনে নেয়া। প্রজাতি ভেদে এবং একই প্রজাতির মাছের বিভিন্ন জীবন স্তরে পুষ্টি চাহিদা ভিন্নতর হয়। দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের জন্য মাছের খাদ্যে আমিষ জাতীয় বিশেষ করে প্রাণিজ আমিষের উপাদান ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । রুই জাতীয় মাছের খাদ্যে আমিষের চাহিদা প্রজাতি ভেদে ৩০-৪০% এর মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব, সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদনের জন্য রুই জাতীয় মাছের সম্পূরক খাদ্যে কম পক্ষে ৩০% আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়। তবে,আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎস উপাদানের মূল্য অত্যধিক বিধায় স্বল্প মূল্যের সম্পূরক খাদ্য তৈরীর জন্য খাদ্যে ২০-৩০% আমিষ রাখা যেতে পারে।

মাছের খাদ্য উপাদান সমূহ

মাছের খাদ্য উপাদান নির্ধারণ এর পূর্বে বিশেষভাবে দেখতে হবে ব্যব ত উপাদানগুলির গুণগতমান কেমন,তা সহজে পাওয়া যাবে কিনা এবং তার মূল্য সস্তা কিনা। সর্বনিম্ন খরচে ভাল মানের সহজপ্রাপ্য খাবার প্রয়োগ করে অধিক হারে মাছ উৎপাদন করাই আধুনিক মাছ চাষের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি ভিত্তিক দেশ। মাছের খাদ্য তৈরীর জন্য ব্যব ত হতে পারে এমন অনেক উপাদান আমাদের দেশে রয়েছে। এসব উপাদান সহজে ও কম মূল্যে পাওয়া যায় এবং এদের পুষ্টিগত মানও উন্নত।

মাছের খাদ্য তৈরীর সুত্র

খাদ্যের সুত্র তৈরীর প্রথমে মাছের পুষ্টি চাহিদা ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী কম মূল্যের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য উপাদান এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে চাষকৃত মাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং দামও কম হয়। সাধারণত খাদ্যের উৎপাদন খরচ মাছের বিক্রয় মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগের বেশি হওয়া উচিত নয় । সুষম খাদ্য তৈরীর জন্য খাদ্যের সাথে সাধারণত (০.৫-২%) ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রন ব্যবহার করতে হয়। খাবার পানিতে বেশিক্ষণ স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসাবে আটা অথবা ময়দা অথবা চিটাগুড় ব্যবহার করতে হয়। চাষীদের সংগতির কথা বিবেচনা করে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ এবং আতুড় পুকুরে পোনা মাছ চাষের জন্য দুটো সম্পূরক খাদ্যের সুত্র নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সারণি ২ ঃ রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের সম্পূরক খাদ্যের সূত্র

উপাদানের নাম	ব্যবহারের মাত্রা (%)	আমিষ (%)
ফিসমিল	১০.০০	৪.২৪
চালের কুঁড়া	৫৩.০০	৬.৩০
সরিষার খৈল	৩০.৫০	৯.১১
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.৫০	-
চিটাগুড়	৬.০০	০.২৭
মোট	১০০.০০	২০.০০

প্রতি কেজি খাবারের মূল্য ৬.১৫ টাকা, উৎস ঃ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট।

সারণি ৩ ঃ রুই জাতীয় মাছের নার্সারী খাদ্যের সূত্র।

উপাদানের নাম	ব্যবহারের মাত্র (%)	আমিষ (%)
ফিসমিল	২১.০০	১২.১৩
সরিষার খৈল	৪৫.০০	১৩.৬৫
চালের কুড়া	২৮.০০	৩.৩৩
আটা	৫.০০	০.৮৯
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১.০০	-
মোট	১,০০.০০	৩০.০০

প্রতি কেজি খাবারের মূল্য - ১০.০০ টাকা, উৎস ঃ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট।

খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

খাবার তৈরীর সময় মাছের আকৃতি ও খাবারের ধরণ বিবেচনায় রেখে খাবার তৈরী করতে হবে। উপরে বর্ণিত সুত্রানুযায়ী ভাল মানের খাদ্য উপাদান মেশিনে বা ঢেকিতে ভাল করে গুড়া করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে চালনি দিয়ে বেলে নিতে হবে। এরপর সুত্র অনুযায়ী উপাদান সমুহ একটি একটি করে নিদিষ্ট মাত্রায় মেপে নিতে হবে এবং অল্প করে বড় একটি মাত্রে ঢেলে হাত কিংবা লাঠি দিয়ে শুকনা অবস্থায় ভালভাবে মিশিতে হবে। ভালভাবে মিশানোর পর অল্প অল্প করে পানি এমনভাবে মিশিয়ে নাড়তে হবে যাতে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠালো পেষ্ট বা মন্ডে পরিণত হয়। বাইন্ডার হিসাবে চিটাগুড় ব্যবহার করলে চিটাগুড়কে প্রথমে পানিতে মিশিয়ে পাতলা করে উপরোক্ত নিয়মে পেষ্ট বা মন্ড তৈরী করতে হয়। এই পেষ্ট বা মন্ড ভেজা খাদ্য হিসাবে সরাসরি মাছকে দেয়া যেতে পারে অথবা পিলেট বা বড়ি আকারে দানাদার খাদ্য তৈরী করে শুকিয়ে রাখা যায়। পিলেট বা বড়ির আকার চাষকৃত মাছের মুখে নিয়ে খেতে পারে। নিদিষ্ট আকারের চালনী ব্যবহার করে এটা করা যায়। হস্তচালিত সেমাই মেশিনের মত লোহা দিয়ে কম খরচে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মেশিন তৈরী করে হাতে চালিয়েও পিলেট/বড়ি তৈরী করা যেতে পারে। তৈরী পিলেট/বড়ি পলিথিন সীটে বা চাটাইতে রেখে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে পলিথিনের বস্তায় অথবা কোন পাত্রে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হয়। মাঝে মাঝে সংরক্ষিত খাবার পূণরায় রোদে শুকিয়ে ঠিকমতো সংরক্ষণ না করলে ছত্রাক ও পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে খাবারের মান নষ্ট হতে পারে। তাই পিলেট/বড়ি খাবার ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা উচিৎ।

খাদ্য ব্যবহারের হার ও পদ্ধতি

পুকুরে সরবরাহকৃত কৃত্রিম খাবারের সম্পূর্ণভাবে মাছ গ্রহণ করলেই কেবলমাত্র মাছের কাংখিত বৃদ্ধি ও উৎপাদন আশা করা যায়। আর খাবারের পূর্ণ ব্যবহার নির্ভর করে মাছের আকার, প্রজাতি, খাদ্যের প্রকৃতি, আকার, সরবরাহ পদ্ধতি এবং সর্বোপরি ব্যবস্থাপনার ওপর। নিম্নের ছকে এ বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ করা হলো ঃ

সারণি ৪ ঃ আকার ও প্রজাতি ভিত্তিক খাদ্য প্রয়োগের হার,মাত্রা ও পদ্ধতি

চাষ ব্যবস্থাপনা	খাবারের ধরণ	প্রয়োগের হার	প্রয়োগের মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
রেনুপোনা চাষ	পাউডার	প্রথম ৫ দিন মোট ওজনের সমান	প্রতিদিন ৩-৪ বার	পাতলা করে পানিতে গুলে পুকুরের চারিদিকের পানিতে কিনারায় ছিটিয়ে দিতে হবে।
ধানী পোনা চাষ	পাউডার দানাদার ও ভেজা	মাছের মোট ওজনের ১০-১২ ভাগ	প্রতিদিন ৩-৪ বার	পুকুরের পানিতে চারপাশে ৪-৫ টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ	পিলেট	মাছের মোট ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ	প্রতিদিন ২ বার	পুকুরের চারপাশে ৪-৫ টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
	ভেজা খাদ্য	মাছের মোট ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ	২ বার	পুকুরের চারপাশে ৪-৫ টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
	পাউডার	ভেজা খাদ্যের অর্ধেক	প্রতি দিন ১-২ বার	পুকুরের নির্দিষ্ট ২-৩ টি জায়গায় পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে গ্রাস কার্প চাষ	সবুজ ঘাস ও লতাপাতা	শরীরের ওজনের শতকরা ৪৫-৭৫ ভাগ।	প্রতিদিন ২-৩ বার	* পুকুরের নির্দিষ্ট ২-৩ টি জায়গায় পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

* গ্রাস কার্পের জন্য সবুজ নরম ঘাস, লতাপাতা ছোট ছোট করে কেটে মজুদকৃত গ্রাস কার্প মাছের মোট ওজনের শতকরা ৪৫-৭৫ ভাগ ঘাস জাতীয় খাবার পুকুরের নির্দিষ্ট ২-৩ টি স্থানে বাশ অথবা কলার পাতা দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করে তার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রাস কার্প সেখান থেকে খাবার টেনে টেনে খাবে। এমনকি শুধুমাত্র কলার পাতা পুকুরে একটি খুটির সাথে বেঁধে দিলেও গ্রাসকার্প তা খেয়ে ফেলবে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি শতাংশে ৩ থেকে ৪ টি তিন অথবা চার ইঞ্চি আকারের গ্রাস কার্প মিশ্রচাষে মজুদ করলে শুধুমাত্র তাদের শরীরের ওজনের শতকরা ৪৫ থেকে ৭৫ ভাগ ঘাস সরবরাহ করলে বাকী মাছের জন্য পুকুরে কোন সম্পূরক খাবার প্রয়োগ না করলেও অন্যান্য মাছের খাদ্যের কোন অভাব হবে না। কারণ, গ্রাসকার্প যে ঘাস খায় তার বিরাট অংশ মাছের পায়খানার সাথে পুকুরে বেরিয়ে আসে যা জৈবিক সার হিসাবে পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধি করে অন্যান্য মাছের খাবার উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে।

মনে রাখা প্রয়োজন

১. প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাবার প্রয়োগ করতে হবে। তাতে মাছ নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে খাবার খেয়ে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। ফলে, খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিৎ হয়।

২. ধানী পোনা চাষের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে একবার ও মিশ্রচাষের প্রতি ১৫/৩০ দিনে একবার নমুনা সংগ্রহ করে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে হিসেব করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

৩. বৃষ্টির দিনে পুকুরের অবস্থা লক্ষ্য করে খাবারের পরিমাণ বন্ধ অথবা কমাতে হবে।

৪. সার প্রয়োগ বা অন্যান্য কারণে পুকুরের পানিতে খাবারের আধিক্য দেখা দিলে বা পানি দূষিত হয়ে গেলে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ, সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধান ও সম্ভাবনা

মোঃ রেজাউল করিম
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খুলনা
হাবিবুর রহমান খন্দকার
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় নদ-নদীতে প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা ও বাগদা উভয় প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা প্রাপ্তির সুবিধা থাকায় আধা লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ এবং স্বাদু পানিতে গলদা চিংড়ির চাষ অতি পুরাতন এবং প্রচলিত নিয়ম। নিজস্ব কৌশলেই প্রায় ৫০ বেশি স্থানীয়ভাবে চিংড়ি খামারকে ঘের বা ঘোনা বলা হয়। ঘেরে জোয়ার ভাটায় পানি আদান প্রদানের মাধ্যমে অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় চিংড়ি চাষ পরিচালিত। যার ফলে উৎপাদন ও আয় তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণ খরচ, জমির ইজারা মূল্য, শ্রমিকের বেতন এবং পোনার মূল্য কম থাকায় চিংড়ি চাষ লাভজনক। অত্যন্ত লাভজনক বলেই স্থানীয় জনসাধারণ উৎসাহিত হয়েছে চিংড়ি চাষে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, মাটি ও পানির গুণগতমান, বাজারে চিংড়ির মূল্য বৃদ্ধি আর্ন্তজাতিক বাজারে চাহিদা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হওয়ায় চিংড়ি চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি গলদা চিংড়ির চাষও যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। চিংড়ি চাষ এলাকা ভিত্তিক সম্প্রসারিত হলেও বর্তমান চাষ পদ্ধতির কৌশল এবং সফলতাকে চিংড়ি চাষের উন্নয়ন কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তবে দেশের চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে দেশী - বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং এর পাশাপাশি অনেক সমস্যা চি ত করেছেন। চি ত সমস্যাবলী সমাধানের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে চিংড়ি চাষের যথেষ্ট উন্নয়ন আশা করা যায়।

চিংড়ি চাষের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে ছোট বড় প্রায় ১৫,৯৭৮টি বাগদা ও ২৬,৯৩৫টি গলদা চিংড়ির খামার রয়েছে। এ সব খামারের মোট আয়তন প্রায় ১.৫০ লক্ষ হেক্টর। বর্তমানে প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক গড় উৎপাদন ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি। খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান ও চিংড়ি চাষ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই) চিংড়ি চাষ এবং বর্ষা মৌসুমে (আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর) ধান চাষ পদ্ধতি স্থানীয় জনগণের কাছে সর্বত্র পরিচিত। এ সব এলাকায় বার্ষিক চিংড়ির গড় উৎপাদন ১৫০ থেকে ২০০ কেজি/হেঃ। গলদা চিংড়ি খামার সমুহে বার্ষিক গড় উৎপাদন ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি/হেঃ । খুলনা অঞ্চলে সম্প্রতিকালে গড়ে উঠা পাম্পপেড ঘেরে বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০ কেজি/হেঃ। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী জেলাওয়ারী চিংড়ি খামারের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	খামারের সংখ্যা		খামারের আয়তন (হেঃ)	
		বাগদা	গলদা	বাগদা	গলদা
১।	খুলনা	৪০০০	১০৭০০	৪০০০০.০০	৪২০০.০০
২।	সাতক্ষীরা	৫০০০	৩০	৩০২৩১.০০	২৫.০০
৩।	বাগেরহাট	৪৯০০	১৬০০০	৪৮৭০০.০০	৫৮০০.০০
৪।	যশোর	-	৮০	-	৬৮.০০
৫।	নড়াইল	-	৪০	-	২৫.০০
৬।	পটুয়াখালী	৪৮	২০	২৫২.০০	২০.০০
৭।	নোয়াখালী	৩০	২০	১৫০.০০	১৪.০০
৮।	গোপালগঞ্জ	-	১৫	-	২২.০০

৯।	মাদারীপুর	-	৩০	-	৩২.০০
১০।	কক্সবাজার	২০০০	-	২৭৫০০.০০	-
	মোট	১৫৯৭৮	২৬৯৩৫	১৪৬৮৩৩.০০	১০২০৬.০০

চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

চিংড়ি চাষের এলাকা ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হলেও চাষ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এখনো আসেনি এবং সাস্‌টেইনেবল চাষ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তা ছাড়া ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদন ও আয় আশাব্যঞ্জক। তবে প্রচলিত চাষ পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। প্রচলিত বা সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির পাশাপাশি উন্নত সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি এবং আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতির কিছু সাফল্য এসেছে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে চিংড়ি চাষ পদ্ধতিকে প্রধানতঃ ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

ক. প্রচলিত নিয়মে ব্যাপক চিংড়ি চাষ (Extensive)
খ. উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ (Improved Extensive)
গ. আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ (Semi-intensive)
ঘ. গলদা-কার্প মিশ্র চাষ (Galda-carp Poly Culture)

উন্নত কৌশলগত আধানিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি এলাকা ভিত্তিক কোথাও কোথাও চালু হলেও এ জাতীয় খামারের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে। আমাদের দেশের পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ সর্বত্র প্রযোজ্য। এ পদ্ধতি সাসটেইনেবল করার জন্য যে সব মৌলিক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তা হলো ঃ

- খামারের আয়তন ছোট করা (৫-১০ হেঃ)।
- পরিকল্পিতভাবে খামার প্রস্তুত করে মাটি ও পানির গুণগত মান বজায় রাখা।
- নার্সারীতে প্রতিপালন পূর্বক বাছাইকৃত সুস্থ্য ও সবল পোনা মজুদ করা।
- ক্ষতিকর প্রাণী ও রাক্ষুসে প্রাণী দমনের ব্যবস্থা নেয়া।
- উপযুক্ত গভীরতায় পানি ধরে রাখা (৮০-১১০ সেঃমিঃ)।
- প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য নিয়মিত ও পরিমিত সার দেয়া।
- প্রয়োজনে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা।
- সময়মত চিংড়ি আহরণ করা।

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এবং পরিবেশের সহণীয় প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নিঃসন্দেহে বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক অবদান

চিংড়ি চাষ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট শিল্প বিপ্লব। এ বিপ্লব বাংলাদেশের চিংড়ি চাষীদের নীরব পরিশ্রমের ফসল। এ ফসল জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে। দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিংড়ি চাষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমুদ্র থেকে আহরণ ছাড়াই মাথাসহ চাষকৃত চিংড়ির উৎপাদন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার মেঃ টন। চিংড়ি উৎপাদন থেকে আয় হয় প্রায় ১২ শ' কোটি টাকা। তবে বর্তমান চাষ পদ্ধতির উন্নতি সাধন ও কৌশলগত অব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন ২ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোনার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র নারী পুরুষ এবং ছেলে মেয়ে সমূদ্র উপকূল ও নদীতে পোনা আহরণ কাজে নিয়োজিত। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রায় ৯০ থেকে ৯৫টি

প্রক্রিয়াজাত কারখানা রয়েছে। এ সব কারখানায় স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিংড়ি শিল্পে নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। চিংড়ি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা বাংলাদেশে সরকারের রপ্তানি বানিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হিসাবে বিবেচিত।

চিংড়ি চাষের জন্য পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া

অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে এলাকার গো-সম্পদ ও গাছপালা হ্রাস পাচ্ছে। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হওয়ায় ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীদের বর্গা পদ্ধতিতে ধান চাষের সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা আহরণের ফলে উপকূলীয় জলাশয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে চলছে। তাই চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও সামাজিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য চিংড়ি চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে একান্ত প্রয়োজন। খামারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি চাষ নয় বরং পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ ও চাষের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার প্রত্যয়ে চিংড়ি চাষের উন্নয়নের ধারা এগিয়ে নিতে হবে। আর এটা সম্ভব পর্যায়ক্রমিকভাবেই। অনেকেই পূর্ণাঙ্গ না হলেও পর্যায়ক্রমিকভাবে চিংড়ি চাষের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এমতাবস্থায় খামারের আয়তন, পোনা মজুদ, পানি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

চিংড়ি চাষ উন্নয়নে সমস্যা

চিংড়ি চাষ উন্নয়নের অনেক সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ উন্নয়নে কারিগরি ও অবকাঠামোগত সমস্যা অন্যতম। প্রকৃত চিংড়ি খামারের জন্য কোন আদর্শ নক্সা নেই। বাস্তবতা, আর্থিক সামর্থ, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে খামারের আয়তন র্ণিয় করা হয়। কিন্তু বেড়ী বাঁধ, পানি নিয়ন্ত্রণ গেইট, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ চাষীদের মধ্যে যথেষ্ট অবহেলা পরিলক্ষিত। যার ফলে চাষীদেরকে অনেক সময় ফসল হানির সম্মুখীন হতে হয়।

২. পোনা আহরণকারীগণ ঘন ফাঁসের জাল ব্যবহার করে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা আহরণ করে থাকেন। তাই বাগদা চিংড়ি পোনার সাথে প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের পোনা ধরা পড়ে। যা তাৎক্ষণিকভাবেই মারা যায়। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়ের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৩. উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ছাড়াই আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ কৌশল প্রবর্তনের প্রবণতা বেড়েছে। চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছাড়াই এ সব চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

৪. পোনা প্রাপ্তির স্বল্পতা একটি জাতীয় সমস্যা। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা না পাওয়ার কারণে অন্য দেশ থেকে পোনা আমদানির ফলে চিংড়ি রোগের প্রার্দুভাব বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি অন্যতম সমস্যা।

৫. অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।

৬. দীর্ঘকাল একই জমিতে চিংড়ি চাষ করার ফলে মাটিতে হাইড্রোজেন সালফাইড ও মিথেন গ্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হওয়া এবং পক্ষান্তরে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়া।

৭. চাষ পদ্ধতির বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা।

৮. স্থানীয় অবস্থা এবং পরিবেশ বিবেচনা না করে বিদেশী প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

৯. দক্ষ জনশক্তির অভাব থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া।

১০. গলি ভরাটের ফলে পানির সঠিক গভীরতা ও গুনগত মান বজায় না থাকা।

১১. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে চিংড়ির গুণগত মান বিনষ্ট হওয়া।

১২. চিংড়ি চাষের কৌশল পরিবর্তনের সাথে সাথে চিংড়ি রোগের প্রার্দুভাব এবং চিংড়ি রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা না থাকায় চিংড়ি চাষে নিরুৎসাহিত হওয়া।

১৩. চিংড়ি চাষ এলাকার আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তার অভাব।

১৪. চিংড়ি চাষ উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় না থাকা।

১৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকে হতে ঋণ প্রদানে জটিলতা।

সমস্যার সমাধান

* প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে আহরণ হ্রাস করে হ্যাচারী স্থাপনের মাধ্যমে পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
* প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহিত বাগদা চিংড়ির পোনা ব্যতিত অন্যান্য চিংড়ির পোনা, মাছের ডিম জলজপ্রাণী নিধনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পোনা সংগ্রহকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
* চিংড়ি চাষ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পশু সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পশু খাদ্য সংরক্ষণের জন্য চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
* সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাছপালাও শাকশব্জি সংরক্ষণ করতে হবে।
* একই জমিতে অধিককাল চিংড়ি চাষ না করে বিকল্প শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
* ভূমিহীনদেরকে চিংড়ি খামারে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
* জমির মালিকদের সমন্বয়ে দলগঠনের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ চালু করতে হবে এবং বহিরাগতদেরকে প্রত্যাহার করতে হবে।
* চাষ পদ্ধতির আলোকে সময়মত ও পরিমিত পোনা মজুদ করতে হবে।
* পরিমিত খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।
* চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চিংড়ি রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* পর্যায়ক্রমিক ধান ও চিংড়ি চাষের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
* চিংড়ি চাষের উপযুক্ত এলাকা চি িত করে সরকারীভাবে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
* স্বল্প মূল্যে চিংড়ি চাষের উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিংড়ি চাষ উন্নয়নের সম্ভবনা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ কৌশল সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমানে যে প্রযুক্তি আছে তা কাজে লাগিয়েই পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করা হলে উৎপাদন আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে উৎপাদনের উপকরণ প্রাপ্তি সহজতর হলে স্থান বিশেষ আধা-নিবিড় বা নিবিড় চিংড়ি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সকল প্রকারের চাষ কৌশলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা অপরিহার্য।

* আধা-নিবিড় ও নিবিড় চিংড়ি চাষ কৌশল প্রবর্তনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে করে বছরে অন্ততঃ পক্ষে ২ থেকে ৩টি ফলন পাওয়া যাচ্ছে।
* আধা-নিবিড় ও নিবিড় চিংড়ি চাষের জন্য প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান, অতিরিক্ত বিনিয়োগ, অতিরিক্ত পোনা মজুদ, নিয়মিত ফরমুলেটেড ফীড সরবরাহ, নিয়মিত পানি পরিবর্তন, বায়ু সঞ্চালন এবং সার্বক্ষনিক ব্যবস্থাপনা ও কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই উক্ত বিষয়ের ওপর অবহেলা করা যাবে না।
* সকল প্রকার চিংড়ি চাষ কৌশল সময়মত ও পরিমিত পোনা মজুদ করতে হবে। জেনে রাখতে হবে অতিরিক্ত পোনা মজুদে বেশি উৎপাদনের সহায়ক নয় বরং ক্ষতিকর । অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা হলে ৫০ থেকে ৬০ দিন পর কোন এক সময়ে চিংড়ি দেহ বর্ধন ব্যাহত হয় এবং শেষ অবশেষে এরা ব্যাপক হারে মারা যেতে থাকে।
* সকল প্রকারের চিংড়ি চাষ কৌশলে সময়মত ও পরিমিত এবং উপযুক্ত খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ খামার প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত খাবার প্রয়োগ করা হলে কোন মূহূর্তে পানি দূষিত হতে পারে এবং রোগ বালাই সৃষ্টির মাধ্যমে চিংড়ির মরণ ঘটতে পারে।

* অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চিংড়ি আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা নিতে হবে। চিংড়ি আহরণের সাথে সাথেই এটি ছায়াযুক্ত পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং যথা শীঘ্রই নিকটবর্তী প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য পাঠাতে হবে।
* চিংড়ি চাষে সকল প্রকার কৌশল অবলম্বনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম একটি অপরের পরিপূরক। যে কোন ধাপে অবহেলা করা হলে চিংড়ি উৎপাদন ব্যাহত হবে।

চিংড়ি রপ্তানিকৃত আয় আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে থাকে। তবে আমাদেরকে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষে এগিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া এলাকা ভিত্তিক চিংড়ি চাষ লাভজনক কিনা মূল্যায়ণ করে দেখতে হবে। দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এখানে সেখানে চিংড়ি চাষ না করে উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন এনে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বনাম পরিবেশ বিপর্যয়

অর্জুন চন্দ্র চন্দ
সহকারী পরিচালক

সূচনা

প্রকৃতির অবারিত দানে ভরপূর আমাদের এই বাংলাদেশ । পৃথিবীর ব দেশের আবহাওয়া এমনই যে, প্রকৃতি সেখানে বছরের অধিকাংশ সময়ই থাকে উৎপাদন বিমূখ, রুক্ষ কংকরময় মাটি উদ্ভিদদের প্রাণ স্পন্দনে বাড়ায় না সহায়তার হাত। সেখানে বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলের ভূমি ও জল সম্পদ এবং আবহাওয়া কৃষিজ ও প্রাণিজ উৎপাদনের এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি । এর পরেও আমাদের মাটির নীচেই রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কঠিন শিলার স্তর, আছে বিপুল গ্যাস সম্পদ সেই সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে আরও এক অমূল্য সম্পদ-চিংড়ি অর্থনীতির বিচারে যার ভূমিকা তরল সোনা বা পেট্রোলেয়মের সঙ্গে তুলনীয় তবে তেল, গ্যাস বা শিল যেখানে মুধুমাত্র আহরনেই সম্পদ হয়ে যায়, চিংড়ির জন্য সেখানে প্রয়োজন চাষের উপযুক্ত পরিবেশ চিংড়ি চাষ তথা চিংড়ি উৎপাদন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে আজ এক ধনাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ন ।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে চিংড়ি

বিশ্ব বাজারে চিংড়ি খাদ্য হিসেবে এক লোভনীয় ও আকর্ষনীয় সামগ্রী । স্বাদ ও পুষ্টির কারণে বিশ্বে এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান চিংড়ি আজ বাংলদেশে এক বিরাট শিল্পরুপে পরিচিতি লাভ করেছে । এই চিংড়ি শিল্পের সহিত জড়িত রয়েছে হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা । গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারে চিংড়ি চাষ অতীব গুরুত্বপূর্ন । দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে চিংড়ি একটি বড় ধরনের মূখ্য ভূমিকা রাখছে । ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে চিংড়ি রপ্তানি থেকে দেশের আয় ছিল ১০৪৫.৬৭ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১১০৬.৩৯ কোটি টাকা । ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৮৮.৯১ কোটি টাকা ।

বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের শতকরা ৬.৩২ ভাগ চিংড়ি রপ্তানি থেকে আসে । চিংড়ির এই অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনায় এনে প্রয়োজন চিংড়ি চাষের উন্নতি ও প্রসার । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এত উজ্জ্বল সম্ভাবনাপুর্ন এই চিংড়ি চাষও নানা কারণে প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয় বা পূর্নভাবে বিকশিত হতে পারছে না । বাংলাদেশের মতন একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এটা যে কত দুর্ভাগ্যজনক তা সহজেই অনুমেয় ।

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ

চিংড়ি চাষ বাংলাদেশে ব পূর্ব হতেই প্রচলিত । আর্ন্তজাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ৭০ এর দশক থেকে চিংড়ি চাষের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ।

বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে "উন্নত ও প্রচলিত পদ্ধতিতে" চিংড়ি চাষ শুরু হয় এবং সংরক্ষণ ও বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াজাত করা শিল্প স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । আশির দশকে প্রায় ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। নব্বই এর দশকে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৮০,০০০ হেক্টর এবং তা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৪১.৩৫৩ হেক্টরে । আশি এবং নব্বই এর দশকে ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ রপ্তানির কাজ চলতে থাকে । এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দারুণভাবে লাভবান হয় । তবে এর পাশাপাশি দেশে কিছু কিছু সমস্যার ও সৃষ্টি হয় ।

চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যা

চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সব প্রধান সমস্যার সৃষ্টি রয়েছে সেগুলো হলো ঃ-

১. চিংড়ি চাষ এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সমস্যা ।

২. চিংড়ি চাষ এলাকায় সামাজিক বিপর্যয়ের সমস্যা ।

৩. চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা ।

১. চিংড়ি চাষ এলাকায় প্রকৃতিক বিপর্যয়ের সমস্যা

মিষ্টি পানির চিংড়ি চাষ এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোন সংবাদ আমাদের জানা নাই । শুধুমাত্র লবণ পানির (Brakish) চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রেই এই সমস্যার কথা আমরা জানি । প্রধানত দুই এলাকায় এই সমস্যাটির সৃষ্টি হয়েছে-

ক. সাগরের কাছাকাছি এলাকায় যেখানে চিংড়ি চাষ প্রধানত সাগরের লবণ পারেন উপর নির্ভরশীল ।

খ. দেশের অভ্যন্তরে যেখানে লবণ এবং লবণ পানি ব্যবহার করে এ ধরনের চিংড়ি চাষ করা হয় ।

প্রধানত ষাটের দশকে জাতিসংঘ ঘোষিত সবুজ বিপ্লব দশকে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে কৃষি জমিকে জোয়ারের লোনাপানির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পোল্ডারিং (Poldering) বাবেষ্টনী বাঁধের আওতায় আনা হয় । এ ধরনের বাঁধ নির্মাণের ফলে সাগরের একেবারে কাছের ব হেক্টর এলাকা লোনা পানির হাত থেকে মুক্ত হয় এবং এই সকল এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে । যেমন, নদীর পাশে নদীমুখ (Creek) এর উৎপত্তি বন্ধ হয়, বাঁধের ভিতরে আবাদী ফসল (যেমন- ধান চাষ ইত্যাদি) জম্মায়, লোনা পানির গাছ (যেমন- গেওয়া, সুন্দরী, গড়ান, কেওয়া ইত্যাদি) লুপ্ত হতে থাকে, জনগণ তাদের বসতি গড়তে থাকে এবং চলাচলের রাস্তাঘাট তৈরী করা হয় । বসতি এলাকায় আম, কাঠাল, লাউ, কুমড়া, ইত্যাদি জম্মাতে থাকে ।

এই অবস্থায় আশির দশকে চিংড়ি চাষের জন্য প্রথমত এবং প্রধানত এই এলাকাটিকেই বেছে নেয়া হয় । উদ্যোক্তাগণ প্রথমে বাঁধের ভেতরে এক বা একাধিক মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্র তৈরী করেন এবং তারপর আরও মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নদী বা খাল থেকে চিংড়ি চাষ এলাকায় লোনা পানি আনার জন্য ছোট খাল বা সরবরাহ পথের ব্যবস্থা করেন । ক্রমে ক্রমে আরও মালিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং এভাবে চিংড়ি চাষ আরও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে । এর ফলে ণবণ পানি আবার পরিবেশে স্বাভাবিক প্রভাব ছড়াতে শুরু করে । ফলে লাউ, কুমড়া, আম, কাঠালের গাছ মরতে থাকে, কোন ক্ষেতে ধানের আবাদ ও কমতে থাকে এবং প্রকৃতির এই অন্তত্য স্বাভাবিক এবং সাধারণ পরিবর্তনকেই বর্তমানে এক শ্রেনীর পত্রপত্রিকা "প্রাকৃতিক বিপর্যয়" রুপে আখ্যায়িত করে বাজার গরম করার চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছে । অথচ এটি যে কোন বিপর্যয় নয়, বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক রুপান্তর (Adustment) ।

উপরোক্ত একই কারণে দেশের অভ্যন্তরে যেখানে লবণ পানি ব্যবহার করে চিংড়ির চাষ করা হচ্ছে সেখানেও একই ধরণের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । পানির পরিবর্তিত গুনাগুণের সংগে প্রকৃতির এবং প্রধানতঃ গাছ পালার জম্মানো বিষয়টি যাদের জানা নেই প্রধানত তারাই এমন একটি স্বাভাবিক বিষয়কে বিপর্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন । এই পরিবর্তিত পরিবেশটি আমাদের একজন সাধারণ চাষীর চাষাবাদের বা স্বাভাবিকভাবে বসবাসের উপযোগী না হলেও চিংড়ি চাষের জন্য এটাই উপযুক্ত পরিবেশ ।

২. চিংড়ি চাষ এলাকায় সামাজিক বিপর্যয়ের সমস্যা

চিংড়ি চাষ এলাকায় প্রধানত যে সব সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঃ-

ক. চিংড়ি ঘের এলাকায় সশস্ত্র লোকজনের আনাগোনা এবং এর ফলে গৃহস্থ পরিবার স্বস্থিতে বসবাস করতে পারে না ।

খ. ঘের এলাকায় মাঝে মাঝেই স্বশস্ত্র লুটপাট এবং খুনের ঘটনা ঘটে থাকে ।

গ. ঘের মালিকেরা জমির মালিকদের ন্যায্য পাওনা দেয় না ।

ঘ. ঘেরের ফলে এর পাশের ক্ষেতে ধানের ফলন কমে যায় বা নষ্ট হয় ।

চিংড়ি একটি অত্যন্ত লোভ উদ্রেককারী খাদ্য এবং লাভজনক ফসল । তাই বিরান এলাকায় এটি রক্ষা করার জন্য চাষীদের আত্মরক্ষা মূলক বৈধ হাতিয়ার রাখার প্রয়োজন আছে । বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের হাতিয়ার ধারী মালিকদের বাসস্থানের পাশাপাশি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের বসবাস সম্ভব না হলে প্রয়োজনে উক্ত গৃহস্থ পরিবারগুলিকে বিকল্প স্থানে পুর্নবাসিত করা উচিৎ ।

ঘের মালিক নিরীহ জমির মালিকদের ঠকিয়ে চিংড়ি চাষ করে লাভবান হওয়া কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না । যে সমস্ত মালিকেরা নিরীহ জমির মালিককে ঠকিয়ে চিংড়ি চাষ করছে, তারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী । তাছাড়া ঘেরের পাশের ধান ক্ষেতে ধান ভাল না জন্মানোরই কথা । এ ক্ষেত্রে পাশের জমিতেও ধান না করে অধিকতর লাভের চিংড়ি চাষ করা দেশের স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন নয় কি? ।

অর্থনৈতিক খাতকে সংহত করতে চিংড়ির মতন সুন্দর সম্ভাবনাটি নষ্ট হতে দেয়া যায় না । কিন্তু চিংড়ির বেলায় যেটা ঘটতে যাচ্ছে, সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে ঃ

ক. পরিবেশের স্বাভাবিক পরিবর্তন সমন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তারা সস্তা বাহবার লোভে "পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয়" বলে চিৎকার করে চিংড়ি চাষ নিরুৎসাহিত করতে চাচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ হতে এর জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে না ।

খ. চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাপূর্ন এলাকায় এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ হতে যথাযথ কার্যকরী সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহন করা হচ্ছে না ।

গ. চিংড়ি চাষ এলাকায় জনগণকে প্রতারনার হাত থেকে বাঁচানো এবং শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না ।

ঘ. চিংড়ির গুনাগুণ বজায় রাখার মতন জাতীয় গুরুত্বপূর্ন একটা বিষয়কে কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না ।

৩. প্রক্রিয়াকরণে সমস্যা

জল ভান্ডার থেকে ধৃত চিংড়ি/মাছে স্বাভাবিকভাবেই পরজীব থাকে । অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় হ্যান্ডলিং, সংরক্ষণ, পরিবহন, প্যাকিং ইত্যাদির সময় পরজীবির পরিমাণ আরও বেড়ে যায় । আহরণ কেন্দ্রের আড়ৎদার/শ্রমিকদের অযত্ন ও অবহেলা, অপর্যাপ্ত বরফে নোংরা হোগলা পাতায় কিংবা কাঠের বাক্সে তাপ নিয়ন্ত্রনহীন অবস্থায় সংরক্ষনের ফলে ক্ষতিকর পরজীবি চিংড়ি/মাছকে খাবার অনুপযোগী করে তুলে । তার উপর প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানায় নেয়ার পর কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীগন মান-নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুসরনে যথাযথভাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অবহেলার ফলেও চিংড়ির গুনগতমান নিম্নমুখী হয় ।

তাছাড়া কারখানার নোংরা সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি ব্যবহারে চিংড়ির মান সংকটাপন্ন হয় । তাছাড়া দেশে চিংড়ি সরবরাহের তুলনায় প্রক্রিয়াজাত স্থাপনা বেশী হওয়ায় চিংড়ি ক্রয় ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের মধ্যে অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা লেগে থাকে, ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ে চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণ থাকে না । তাই এ ধরনের অগনিত সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের আজ প্রয়োজন চিংড়ির আহরণ থেকে শুরু করে জাহজীকরণ পর্যন্ত সংকাটময় দূষনমুক্ত পরিবেশ ।

আমরা যদি প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা সমন্ধে ওয়াকিবহাল না হই, চিংড়ির স্বাস্থ্যনীতি মেনে না চলি কিংবা চিংড়ির চাষ ক্ষেত্রের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে ক্রেতা সাধারণের নিকট পৌছানোর পর্যন্ত চিংড়ির মানের পরিবেশ দূষন রোধ করার ব্যবস্থা করতে না পারি তবে আমাদের দেশকে চিংড়ির মতন একটি সংহত অর্থনৈতিক খাতকে চিরতরে হারাতে হবে ।

সমস্যার সামাধানকল্পে কতিপয় প্রস্তাবনা

চিংড়ি শিল্পের উন্নয়নও প্রসারের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাব নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ-

১. চিংড়ি চাষ পর্যায়ে

ক. এ কথা সত্যি যে, জমিতে চিংড়ি চাষ হলে ধান হবে না । কিন্তু যে জমিতে দেশ ও সমাজের পক্ষে এত লাভজনক চিংড়ি চাষ করা সম্ভব, সেখানে তা না করে ধান চাষ করতে যাওয়ার কি যুক্তি আছে । তাই এক্ষেত্রে সারকারী পর্যায়ে চিংড়ি চাষের উপযুক্ত পানির নদীর পাশের একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে (যেমন, ১০ মাইল চওড়া) ই.পি.জেড. হিসেবে ঘোষণা করে শুধুমাত্র চিংড়ি চাষের জন্য বরাদ্ধ করে ইহার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে জমি বর্তমান মালিকেরই থাকবে । রাস্তা যেমন জনগনের অধিকার, চিংড়ি চাষ এলাকায় লোনা পানির খালও হবে ঘের মালিকদের স্বাভাবিক প্রাপ্য। এ ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে জমির অপচয় এবং অপব্যবহার কমবে এবং চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা এলাকায় পূর্ন ব্যবহার সম্ভব হবে ।

খ. পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে চিংড়ি চাষের যুগপোযোগী সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে ।

২. সামাজিক পর্যায়ে

ক. চিংড়ি চাষ এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আইন শৃংখলা বিভাগের ষ্টেশন, আউট পোষ্ট, ইত্যাদি যেখানে প্রয়োজনীয়, সেখানেই স্থাপন করতে হবে ।

খ. বিরান চিংড়ি চাষ এলাকায় গৃহস্থ পরিবারগুলিকে বিকল্প স্থানে বসবাসের জন্য নতুন বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. চিংড়ি চাষ ঘেরের পাশের জমিতে ধান চাষ না করে অধিকতর লাভের চিংড়ি চাষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে ।

ঘ. চিংড়ি চাষে ''পরিবেশ দূষণ বা বিপর্যয়'' উত্তরণের বিস্ময় সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ।

৩. প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে

ক. ই.ইউ. দেশসমূহের দিক থেকে যেমন আমাদের উপর নির্দয় ব্যবহার বরা হয়েছে, তেমনি আমাদের দিক থেকে খারাপ কাজ তো কম করা হয়নি । তাই আমাদেরকে সকল প্রভাবের উর্দ্ধে থেকে রপ্তানিকারী পন্য চিংড়ির মান যথাযথ রাখতে সব রকম পদক্ষেপ নিতে হবে ।

খ. বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করে সেই কার্যক্রমকে কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের মতন দেশের ও জোড়ালো খবরদারী করছে । আমরা তা যথাযথভাবে অনুসরন বা পালন করছি না অজুহাতে আমাদের চিংড়ি নেয়া তারা বন্ধ করে দিচ্ছে । একই রক্ত মাংসের গড়া আমরা একই সৃষ্টিকর্তার মানব সন্তান । আমাদের দেশের প্রক্রিয়াজাতকৃত হিমায়িত খাদ্য খেলে আমরা মানব সন্তানেরা পেটের অসুখে আক্রান্ত নাও হতে পারি কিন্তু তারা আক্রন্ত হতে পারে । রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আমাদের আমদানিকারক দেশে শর্তসমূহ দেশের স্বার্থেই পালন করতে হবে । তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের "হ্যাসাপ" কিংবা ই.ইউ. দেশ সমূহের "ওন চেক সিষ্টেম" এর মতন একটি আর্ন্তজাতিক "মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রথা" হিমায়িত খাদ্য তথা চিংড়ি পণ্যের ক্ষেত্রে চালু করার উদ্যোগ কি আমরা সার্কভূক্ত দেশ সমূহ নিতে পারি না? এই বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে ।

গ. যে পন্যটি দেশ ও সমাজের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হিসেবে আত্ম প্রকাশরত, সেই চিংড়ি নামক পন্যটিকে নিয়ে আর অবহেলার সুযোগ নেই । প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের যত সমস্যাই থাকনা কেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে হলে এর ব্যবস্থাপনা অবশ্যই নিঃশর্তভাবে উন্নত করতে হবে । সরকারকে তাই সব রকমের হিমায়িত খাদ্য বিশেষ করে চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপে আরোপিত ব্যবস্থা সমূহ পালনের প্রতি ব্যবসায়ীদের ও কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে।

ঘ. মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যাতে কোনরুপ কাজে গাফিলতী ও শৈথিল্য প্রদর্শন না করে তা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে ।

উপসংহার

দেশে চিংড়ি চাষ চলছে । সরকার চিংড়ি চাষের স্বাভাবিক কাজকর্ম করে চলেছেন । চিংড়ি বর্তমান সাময়িক অবস্থা যদিও দেশের জন্য বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং বেকার সমস্যা ও সামাজিক সমস্যার উদ্রেককারী, তবুও এই শিল্পের প্রতি আমাদের রয়েছে অনেক অনেক প্রত্যাশা । সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব দেশ ও জাতির জন্য অনেক বড় ক্ষতি বয়ে আনতে পারে । চিংড়ি চাষে **পরিবেশ দূষণীয় বা বিপর্যয়** হচ্ছে এ কথাটি বার বার উচ্চারণ থেকে বিরত থেকে আমাদের উচিৎ হবে দেশের স্বার্থে পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ করে "পরিবেশ দূষণ বা বিপর্যয়" উত্তরণে বিস্ময় সৃষ্টি করা ।

পরিশেষে আলবার্ট আইনষ্টাইনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই "আমাদের সব অনুভূতির মধ্যে সুন্দরতম হলো বিস্ময় । এই আদি অনুভূতি থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রকৃত শিল্প এবং প্রকৃত বিজ্ঞান । বিস্ময়ের অনুভূতি যার নেই, আশ্চর্য হতে অবাক হতে যে অপারগ, সে মানুষ মৃত প্রায়, তার সৃষ্টি আলোকহীন" । তাই বিস্ময় বোধে আচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া চিংড়ি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার সম্ভব নয় ।

চিংড়ির হোয়াইট স্পট এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

মোঃ আবু বক্কার সিকদার
প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

বর্তমানে বাংলাদেশে মাছ ও চিংড়ি দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। চিংড়ি চাষ বিশেষ করে বাগদা চিংড়ির চাষ আমাদের দেশে মূলত সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে সনাতনী ধারায় চাষ হলেও পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে এর চাষ ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১.৫০ লক্ষ হেক্টরে বাগদা চাষ হচ্ছে: এর মধ্যে খুলনা অঞ্চলে বাগদা খামারের আয়তন প্রায় ১.২০ লক্ষ হেঃ। আমরা জানি উৎপাদিত ১০০ ভাগ চিংড়িই বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। যদি হেক্টর প্রতি ৩০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায় তাহলে শুধুমাত্র খুলনা অঞ্চল থেকেই ৩৬ হাজার মেঃ টন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। ১৯৯৪ খ্রিঃ থেকে প্রথম পর্যায়ে কক্সবাজার এলাকায় এবং পরবর্তী বছরগুলো (১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৭) কক্সবাজারসহ সমস্ত চিংড়ি চাষ এলাকার চিংড়ি খামারগুলো ব্যাপকভাবে হোয়াইট স্পট ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়।

যেহেতু এ রোগ ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত, সেহেতু কোন প্রকার ওষুধ দ্বারা এ রোগ চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয়। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন চিংড়ি খামারে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে পারলে এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। তাঁরা আরও জানান যে খামারের পরিবেশ যত ভাল থাকবে চিংড়িতে ভাইরাস রোগের সম্ভবনা তত কম হবে। খামারের পরিবেশ বলতে প্রধানত খামারের মাটি ও পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর কথা বলা যায়। অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি, গঠন, উর্বরতা ও পিএইচ এবং পানির তাপমাত্রা, লবনাক্ততা, অক্সিজেন এবং পিএইচ ইত্যাদির সমষ্টিগত অবস্থাকে বুঝায়। এই মাটি ও পানির এক বা একাধিক গুণাবলী খারাপ হলেই পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। ফলে সেই পরিবেশে চিংড়ি থাকলে স্বাভাবিকভাবে সে দুর্বল ও পীড়িত হয়ে বিভিন্ন রোগের জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। যেহেতু পরিবেশে ভাইরাসের জীবাণুসহ অন্য সমস্ত প্রকার রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকে সেহেতু খামারের পরিবেশ অর্থাৎ মাটি ও পানির এক বা একাধিক গুণাবলী খারাপ হলেই পরিবেশ অভ্যান্তরের পোষক অর্থাৎ চিংড়ি দুর্বল ও পীড়িতের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতপর পরিবেশে অভ্যন্তরে বিদ্যমান ভাইরাসসহ অন্যান্য জীবাণু আরও সক্রিয় হয়ে চিংড়িকে আক্রান্ত করে রোগ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে চিংড়ির ব্যাপকভাবে মড়ক দেখা যেতে থাকে।

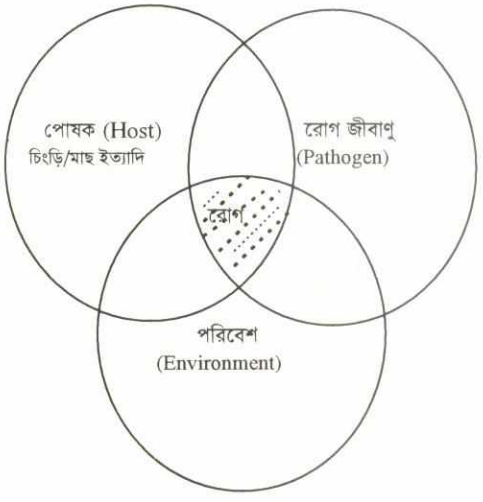

একই খামারে পরিবেশ (Environment +পোষক (Hoste, Target species)+ রোগজীবাণু (Pathogens)

চিংড়ির ভাইরাস সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে পরিবেশ সহনীয় এবং সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদী চিংড়িচাষ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য করণীয় ঃ

এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হলে প্রধানত তিনটি বিভাগ/সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। **প্রথমত** মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান। **দ্বিতীয়ত** Support facilities অর্থাৎ সহায়ক সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার দায়িত্বশীল ভুমিকার নিশ্চয়তা প্রদান। **তৃতীয়ত** সুফলভোগী চিংড়ি চাষীদের অধিকার সচেতনসহ পরামর্শ গ্রহণে স্বদিচ্ছা এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে চেষ্টা করা।

মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ সম্পৃক্ত কাজ সমূহ

১. চিংড়ি চাষ এলাকার উপযুক্ত স্থানে খামার নির্বাচন করা।
২. খামারের আয়তন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা (৫-২৫ হেঃ)।
৩. খামারের প্রধান ভেড়ীবাঁধের উচ্চতা ৪-৬ ফুটের মধ্যে রাখা।
৪. খামারের আয়তন অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট ফল বোর্ডসহ নির্মাণ করা।
৫. খামারের অভ্যন্তরে আড়াআড়ি বা চারিধারে ১০-২০ ভাগ এলাকায় খাল/জলাধার রাখা। এই খালের গড় গভীরতা ২০-৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে রাখা।
৬. প্রত্যেকটি খামারে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য পৃথক জলাধার বা নালা রাখা,যার গভীরতা হতে হবে ৫-৬ ফুট।
৭. খামার প্রস্তুতের পূর্বে খামারের তলদেশে জমাকৃত পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত জৈব পদার্থসহ কালো মাটি যতদূর সম্ভব সরিয়ে ফেলা।
৮. ঘেরে তলদেশ এমনভাবে চাষ করা (অনধিক ৪ ইঞ্চি) যাতে করে পানি উঠানোর পর ঘেরের তলদেশ হালকা কাঁদাযুক্ত থাকা।
৯. চাষের পরে খামারটি ৭-১০ দিন শুকানো এবং ক্ষয়যুক্ত মাটি হলে শুকানোর মাত্রা কমিয়ে ২-৩ দিন রাখা।
১০. ঘেরের মাটি পরীক্ষা করে অম্লতার ভিত্তিতে (পিএইচ) সঠিক পরিমাণে চুন/পাথুরে চুন প্রয়োগ করা।
১১. মাটির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা।
১২. প্রথম ২-৩ দিন ঘেরে ১০-২০ সেন্টিমিটার পানি উঠিয়ে অপেক্ষা করা এবং পরে ৭-১০ দিনের মধ্যে ঘেরে ৫০-৭০ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি করা।
১৩. প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে চিংড়ি পোনা (পিএল ১০-১৫) হেক্টর প্রতি প্রথম পর্যায় ৭-৮ হাজার এবং দ্বিতীয় পর্যায় ৩-৪ হাজার পোনা ঘেরে মজুদ করা।
১৪. চিংড়ি পোনা ছাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ঘেরের পানি ৩-৪ ফুট বৃদ্ধি করে এই গভীরতা চিংড়ি চাষ মৌসুম সময় পর্যন্ত তা ধরে রাখা।
১৫. নির্ধারিত সংখ্যক সবল ও সুস্থ পোনা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘেরে মজুদ করা।
১৬. উপযুক্ত লবনাক্ততা (১০-২৫ পিপিটি) এবং অনুকুল তাপমাত্রায় (২৭-৩০°সেঃ) পোনা মজুদ করা অর্থাৎ খুলনা অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বে ঘেরে পোনা মজুদ না করা।
১৭. ঘেরের পানির গুণাগুন যথা পিএইচ, তাপমাত্রা লবনাক্ততা, স্বচ্ছতা এবং পানির গভীরতা পরীক্ষা করে সে অনুসারে পানি পরিবর্তন ও সার প্রয়োগ করা।

১৮. কোন অবস্থায় ঘেরের পানির গভীরতা ৩ ফুটের নিচে না রাখা।

১৯. নদীর পানি সরাসরি ঘেরে প্রবেশ না করা এবং প্রয়োজনে ঘের সংলগ্ন জলাধারের থিথানো পানি ঘেরে সরবরাহ করা।

২০. কমপক্ষে প্রতি সপ্তাহে ঘেরের চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে তা স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২১. রোগ নিরাময়ের জন্য খামারে কোন ওষুধ পত্র, ভিটামিন,বলকারক খাদ্য বা অন্য কোন উপকরণ প্রয়োগ না করা।

২২. খামার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করা।

২৩. খামারের চিংড়ি বিক্রির উপযোগী হলেই তা ধরে বাজারজাত করা।

২৪. খুলনা এবং বাগেরহাট এলাকার জমিতে চিংড়ি চাষের ফেব্রুয়ারী-জুলাই মাসে ধান চাষ করা (আগষ্ট - জানুয়ারী)।

২৫. সাতক্ষীরার যে সমস্ত এলাকার নদীর পানিতে সারা বছর লবণাক্ততা থাকে, সে সমস্ত এলাকার চিংড়ি ঘেরে বছরে কমপক্ষে তিনমাস (নভেম্বর - জানুয়ারী) চিংড়ি চাষ না করা।

২৬. পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল চিংড়ি চাষীকে একতাবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে চিংড়ি চাষের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা।

সহায়ক সহায়তা (Support facilities) প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার যথার্থভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে কতিপয় সমস্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল

১. চিংড়ি চাষের উপযোগিতার ভিত্তিতে যথাযথভাবে থানা ভিত্তিক চাষ এলাকা নির্ধারণ না হওয়া।

২. চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা না থাকা।

৩. চিংড়ি চাষে সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকাতে লাইসেন্স প্রদানে জটিলতা।

৪. সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবে চিংড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়া।

৫. অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার ফলে চিংড়ির ভাইরাস সহ অন্যান্য রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. একই জমিতে পর্যায়ক্রমে চিংড়ি ও ধান চাষে সময় নির্ধারণে নিশ্চয়তা প্রদান না থাকা।

৭. খামার তৈরির উপযোগিতার ভিত্তিতে অবকাঠামো ও নক্সা সম্বলিত পরিকল্পনা (খামারের স্থান, আয়তন, পানির উৎস, সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট ও খাল, খামার বাটী সংলগ্ন বসতবাটী) ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক লাইসেন্স প্রদান না হওয়া।

৮. বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স গ্রহণের নির্দেশ না থাকায় চিংড়ি চাষীদের লাইসেন্স গ্রহণে অনিহা।

৯. স্থানীয় জনগণের আপত্তি থাকা সত্বেও স্থানীয়/বহিরাগত প্রভাবশালীদের জোর পূর্বক নিয়মনীতির বহির্ভুতভাবে ঘের তৈরি করার প্রবণতা বন্ধ না হওয়া।

১০. সরকার/দেশ চিংড়ি থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা সত্বেও এ সেক্টরে তৃণমূল পর্যায়ে চিংড়ি চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

১১. চিংড়ি চাষ এলাকায় বিদ্যমান সরকারী জলমহাল সমূহ (বদ্ধ) যথাযথভাবে চিংড়ি চাষের আওতায় এনে তার ব্যবহারে নিশ্চিত না করা।

সুফলভোগী চিংড়ি চাষীদের অনভিজ্ঞতার কারণে চিংড়ি চাষে উদ্ভুত কতিপয় সমস্যা

১. অধিক লাভের আশায় কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই চিংড়ি চাষ শুরু করার প্রবণতা।

২. অধিক লাভের আশায় নিম্নমানের স্বল্প সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন এলাকায় খামারের স্থান নির্বাচন করা।

৩. বেশী লাভের আশায় বড় ঘের তৈরীর প্রবণতা।

৪. অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ সহ চাষ ব্যবস্থপনায় সনাতনী ধ্যান ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখা।

৫. চিংড়ি চাষের শুরুতে অধিকাংশ সুফলভোগী চাষ সংক্রান্ত কোন পরামর্শ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা মনে না করা।

৬. পানির উপযুক্ত লবনাক্ততা ও তাপমাত্রা বিবেচনা না করেই অসময়ে (নভেম্বর - জানুয়ারী) ঘেরে পোনা মজুদ প্রবণতা।

৭. প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই, একথা সত্য হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণে চিংড়ি চাষীদের স্বদিচ্ছা ও স্বতঃস্ফুর্ততার অভাব।

৮. কারিগরি পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহ থাকলেও তা বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে অনিহা।

৯. চিংড়ি ঘের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং রোগ প্রতিরোধে ঘেরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না থাকা।

১০. সর্বোপরি অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ কর্মী দ্বারা খামার পরিচালনা করা।

১১. পানি ও মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী বিশেষ করে পানির পিএইচ, লবনাক্ততা, স্বচ্ছতা, তাপমাত্রা ও গভীরতা এবং মাটির পিএইচ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন না থাকা। খামারে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য একই গেট ও খাল ব্যবহার করা।

১২. স্বল্প সময়ের পরিবর্তে দীর্ঘ সময় ধরে ঘেরে চিংড়ি পোনা মজুদ করার প্রবণতা।

চিংড়ির ভাইরাস সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে পরিবেশ সহনীয় এবং সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদি চিংড়ি চাষ কার্যক্রম (উন্নত পদ্ধতি) বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হলো:

১. সর্বাগ্রে সুষ্ঠুভাবে জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা প্রণয়ন।

২. উপযুক্ত কারিগরি তথ্যের উপর ভিত্তি করে চিংড়ি চাষ এলাকা সনাক্তকরণ ও নির্ধারণ।

৩. সকল চিংড়ি খামার মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকরণ।

৪. চাষ পদ্ধতির ভিত্তিতে এলাকা ভিত্তিক উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা।

৫. ঘেরে সুষ্ঠুভাবে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য চিংড়ি চাষ এলাকার সমস্ত খাস খাল ও বদ্ধ জলাশয় মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করা।

৬. পোনা প্রপ্তির নিশ্চয়তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে হ্যাচারী নির্মাণ করা।

৭. চাষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সুবিধার্থে খামারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখা।

৮. ঘেরের সুষ্ঠু পরিবেশ ঠিক রেখে সঠিক সময়ে সঠিক সংখ্যায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পোনা মজুদ করা এবং যথাসময়ে বিক্রি উপযোগী চিংড়ি আহরণ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৯. রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

১০. চিংড়ি পোনা ও খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা ও পরীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা।

চিংড়ির রোগ হওয়ার ফ্লোচার্ট

চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা, পারিবেশিক পীড়ন, চিংড়ি রোগ ও মড়কের যোগসূত্র নিম্নে ফ্লোচার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো:

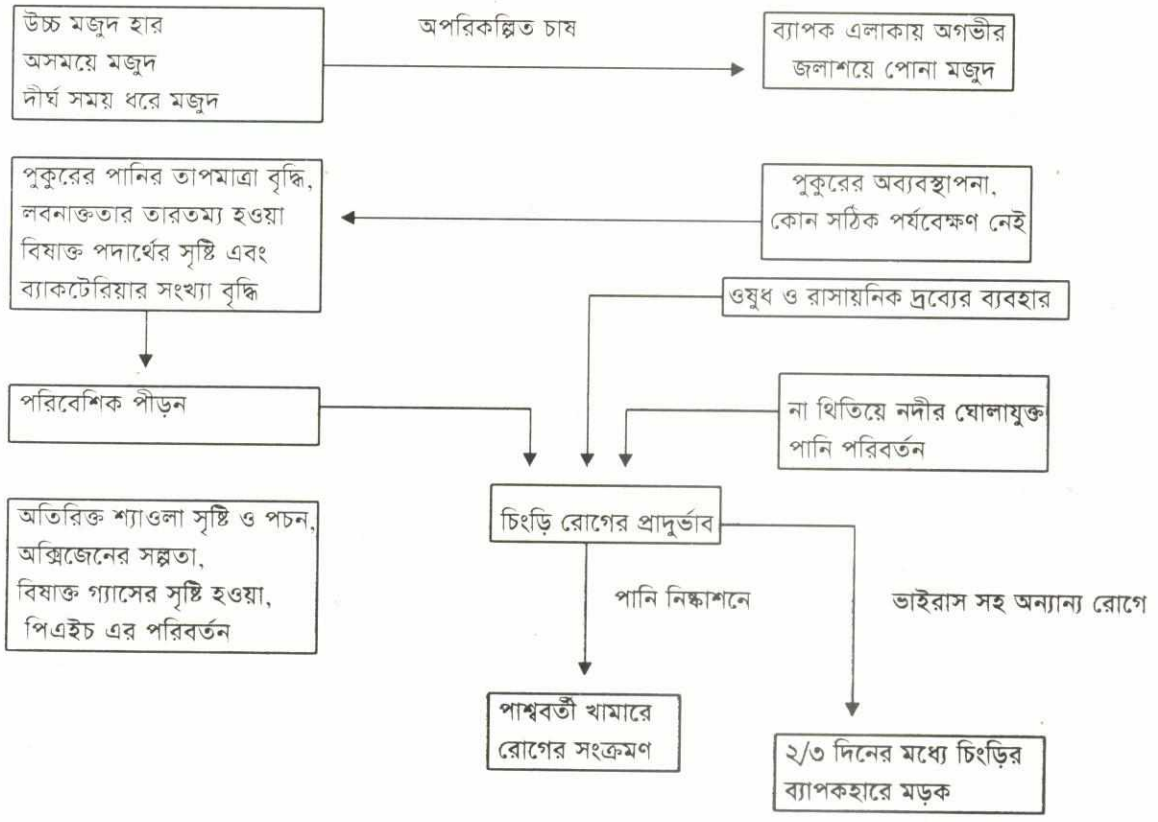

মাছের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

মো: আবুল হাশেম (সুমন)
মৎস্য বিষয়ক কর্মকর্তা
আনসার ও ভিডিপি একাডেমী

এ কথা সত্য যে, সকল জীবিত প্রাণীই কোন না কোন সময় রোগের কবলে পড়ে মাছও এর ব্যতিক্রম নয় । নানাবিধ কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ের চেয়ে বদ্ধজলাশয়ে চাষকৃত মাছে রোগের আক্রমণ বেশি হতে দেখা যায় । তদুপরি দ্রুত শিল্পায়নের ও পরিবেশ দূষণের ফলে জলজ স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে দিনান্তরে মাছে বেশি রোগ বালাই দেখা দিচ্ছে । ফলশ্রুতিতে মাছ, জীবাণু ও পরিবেশের পারস্পরিক অন্তঃক্রিয়ায় নানাবিধ রোগের সৃষ্টির মাধ্যমে মাছ মারা যেতে দেখা যায় । চাষাধীন পুকুরে সংক্রামক রোগ বালাই দেখা দিলে মাছে মড়ক দেখা দেয় এবং মৎস্যচাষী তথা পুকুর মালিকের অপুরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ।

চাষাধীন পুকুরে সাধারণতঃ যে সকল রোগে মাছ আক্রান্ত হতে পারে এমন ধরনের কয়েকটি সাধারণ কারণ, লক্ষণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ।

১. মাছের ক্ষতরোগ

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে প্রথমে মাছে ক্ষতরোগ দেখা দেয় । অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৭২ সালে প্রথমে এ রোগ সনাক্ত করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে নিউগিনী, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কাম্পুচিয়া, লাওস, মায়ানমার, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা হয়ে, বাংলাদেশে এ রোগ বিস্তার লাভ করে । অন্যান্য দেশের মত প্রাকৃতিক ও মুক্ত জলাশয়ের অধিকাংশ মাছে এ রোগ আক্রমণ করে। শীত মৌসুমের প্রারম্ভেই সাধারণতঃ এ রোগ দেখা দেয় ।

পানির প্রতিকূল পরিবেশে প্রথমে ভাইরাস ও পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে মাছে ক্ষতরোগ দেখা দেয় বলে মনে করা হয় । এ রোগে মাছের গায়ে সর্বত্র ছোট বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণে মাছের লেজ ও পাখনা পঁচে খসে পড়ে যায় ও ক্ষতস্থান হতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়। মাছ যত্রতত্র অস্বাভাবিক ভাবে সাঁতার কাটতে দেখা যায়। এ রোগে প্রথমে ২/৪টি মাছ মারা যেতে দেখা যায় এবং তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং অধিকাংশ মাছ মারা যেতে দেখা যায়।

প্রতিকার

জলাশয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক দুষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখাই হবে এই রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা । পুকুরে এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। রোগের প্রার্দুভাব বেশি হলে প্রতি সপ্তাহে উল্লেখিত হারে একবার করে অন্ততঃ তিনবার চুন প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এছাড়া চাষকৃত পুকুরে প্রতি বছর শীত মৌসুমের পুর্বে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে শতাংশ প্রতি এক কেজি হারে চুন আগাম প্রয়োগ করলে অন্ততঃ ঐ মৌসুমে উক্ত জলাশয়ে ক্ষতরোগ দেখা দিবে না বলে আশা করা যায়।

২. লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ

এরোমোনাস জাতীয় এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগে লেজ ও পাখনার পর্দা ছিড়ে যায়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ফলশ্রুতিতে মাছ চলাফেরায় ভারসাম্য হারায়। মাছের দেহ ফ্যাকাশে রং ধারণ করে অবশেষে মাছ মারা যায় । কার্প ও ক্যাটফিস জাতীয় মাছে এ রোগ হতে দেখা যায় ।

প্রতিকার

প্রাথমিক পর্যায়ে রোগে আক্রান্ত পাখনা ও লেজ কেটে ফেলে শতকরা দুইভাগ সিলভার নাইট্রেট দ্রবনে ধৌত করে শতকরা একভাগ পটাশিয়াম পারম্যাঙানেট দ্রবনে ডুবিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। প্রতি কেজি মাছের খাদ্যে ১ গ্রাম হারে ক্লোরোমাইসিটিন মিশিয়ে মাছকে অন্ততঃ ১ সপ্তাহ খাওয়াতে হবে। কপার সালফেট (তুঁতে) ০.৫-১ পি,পি, এম এ এক মিনিট আক্রান্ত মাছকে ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমেও চিকিৎসা করা যায়। এছাড়া পটাশিয়াম পারম্যাঙানেট ২-৩ পি,পি, এম হারে পুকুরের পানিতে প্রয়োগ করেও পুকুর পরিচর্যার মাধ্যমে রোগ প্রতিকার করা যায়।

৩. ফুলকা পচাঁরোগ

ব্রাংকিওমাইসিস নামক এক প্রকার ছত্রাক জাতীয় পরজীবী প্রাণীর আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয় । এ জাতীয় প্রাণী ফুলকার যে অংশে আক্রমণ করে তাতে রক্ত চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয় ফলে আক্রান্ত অংশটি পঁচে খসে পড়ে যায় এবং সময়ের ব্যবধানে মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে দেখা যায় । মাত্রাতিরিক্ত জৈব পচনশীল পদার্থ বিদ্যমান থাকা জলাশয়ে বিশেষ করে গ্রীস্মকালে এ রোগ দেখা দেয় ।

প্রতিকার

এ রোগ প্রতিকারে পুকুরে পরিমিত অর্থাৎ শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুনা প্রয়োগ করতে হবে । এ অবস্থায় পুকুরে সার ও কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি পরিমাণে রোগ দেখা দিলে পুকুরের পানি বদলানো অত্যাবশ্যক।

৪. আঁইস উঠে যাওয়া জনিত রোগ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ । এ রোগের আক্রমণে মাছ তার স্বাভাবিক উজ্জলতা হারিয়ে ফেলে। মাছ অস্বাভাবিকতায় অলস ভাবে চলাফেরা করে। আঁইস বাঁকা হয়ে যায় এবং সামান্য ঘষা বা আঘাতেই উঠে যায়। দেহের বিভিন্ন অংশে কালো দাগ দেখা যায় । কোন কোন ক্ষেত্রে পাখনা সমুহ ছিড়ে যায় ও লেজ অবশ হয়ে যায় ।

প্রতিকার

পুকুরের পানিতে নিম্নহারে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে আক্রান্ত মাছকে চিকিৎসা করা যায়। এক লিটার পানিতে ২ থেকে ৩ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙানেট অথবা ১ লিটার পানিতে .৫-১ মিলিগ্রাম তুঁতে মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে গোসল করালে ভাল ফল আশা করা যায়।

৫. পেটফুলা রোগ (ড্রপসি)

ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে রুই জাতীয় মাছে পেটফুলা রোগ হতে দেখা যায় । এ রোগে মাছের শরীরের বিভিন্ন অংশে তরল পদার্থ জমতে দেখা যায় ।

পেটফুলে বেলুনের মত হয় । চোখ ঠেলে বাহিরের দিকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়/ আঁইস উঠে যেতে থাকে । মাছের খাবারে অরুচি লক্ষ্য করা যায় এবং অলসভাবে বিচরণ করে ।

প্রতিকার

পরিস্কার জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ দিয়ে মাছের শরীরে জমাকৃত তরল পদার্থ বের করে শতকরা ৩ ভাগ লবণ পানিতে মাছকে অন্ততঃ ২০ মিনিট গোসল করানোর মাধ্যমে শৈল্য চিকিৎসা করা যায়। এরপর প্রতি কেজি ওজনের মাছে ১০ মিঃ গ্রাঃ হারে টেরামাইসিন ইনজেকশন সপ্তাহে অন্ততঃ ২ বার দিতে হবে। এ ছাড়া পরিমিত হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের পানিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য পুকুরের পানিতে ২ পি, পি, এম মাত্রায় পটাশিয়াম পারম্যাঙানেট ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন।

৬. সাদা দাগ রোগ (ইকথায়োপথিরিয়াসিস)

ইকথায়োপথিরিয়াস মালটিফিলিস নামক এক প্রকার পরজীবী জীবাণু প্রটোজোয়ার আক্রমনে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগে মাছ ও পোনার শরীরে পাখনা এবং ফুলকায় অসংখ্য ছোট বড় সাদা দাগ দেখা যায়। বেশি ঘনত্বে মাছ ছাড়লে এ রোগ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রোগাক্রান্ত মাছের শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে যায় এবং বেশি আক্রান্তে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার

পরিমিত পরিমাণ চুন অন্ততঃ পর পর ২ সপ্তাহ প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর শোধন করতে হবে। ৩ (তিন) ভাগ লবণ ১০০ ভাগ পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে অন্ততঃ আধঘন্টা গোসল করাতে হবে। এছাড়া তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩৫সেঃ এ উন্নীত করেও এ রোগের প্রতিকার করা যেতে পারে।

৭. কাল দাগ রোগ

মাছের মুখে ও চোখে এ দাগ লক্ষ্য করা যায়। এ রোগের জীবাণু জলচর প্রাণীর ক্ষুদ্র অন্ত্রে বাস করে।

প্রতিকার

চুন বা ব্লিচিং পাউডার পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর শোধন করে নিতে হবে। এক লক্ষ ভাগ পানির সংগে ৭ ভাগ পিকরিক এসিড মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে এক ঘন্টা গোসল করানোর মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়।

৮. ছত্রাক রোগ

এ জাতীয় রোগ মাছের ডিম পোনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মাছে সংক্রমিত হতে দেখা যায়। মাছের ডিমে ও শরীরে কোন কারণে ক্ষতের সৃষ্টি হলে পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাক জাতীয় রোগের আক্রমণ হয়। সেপ্রোলেগনিয়া বা ব্রাংকিওমাইসিস নামক ছত্রাকের দ্বারা রোগের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মাছের শরীরে বা ডিমে তুলার মত দেখেই ছএাক জাতীয় রোগ সনাক্ত করা যায়। ব্রাংকিওমাইসিস এর আক্রমণের ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার দরুন শ্বাস কষ্টে মাছ মারা যেতে দেখা যায়।

প্রতিকার

শতকরা ৩ ভাগ লবণ পানিতে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে অন্তত ঃ ১বার করে ৩-৪ সপ্তাহ গোসল করালে রোগ ভাল হবে। ১ পি.পি. এম কপার সালফেট (তুঁতে) দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ২৪ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলে ছএাক নষ্ট হয়ে যায় অত:পর মাছ পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। ০.৫ পি.পি.এম মিথাইলিন ব্লু পুকুরে প্রয়োগ করেও এ রোগ প্রতিকার করা যেতে পারে।

৯. মাছের জোঁক

পিসসিকোলা নামক এক প্রকার জোঁক এ রোগের কারণ । জোঁকের শরীরের দু'প্রান্তে দু'টি চুষনী আছে । এর একটি চুষনী মুখের কাজ করে। জোঁক মাছের শরীরের রক্ত শোষণ করে ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত মাছ দূর্বল হয়ে অস্থিরভাবে এদিক সেদিক সাঁতার কাটতে থাকে এবং কোন কিছুর সাথে নিজ শরীর ঘষতে দেখা যায়। জোঁক আক্রান্ত ক্ষতস্থান হতে রক্তপাত হয়ে ক্ষতস্থান ফুলে যায় ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার

শতকরা ৩ ভাগ লবণ দ্রবণে ৩০ মিনিট অথবা ০.০৫ ভাগ তুঁতে মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে গোসল করালে অধিকাংশ জোঁক পড়ে যায় এবং বাকীগুলি চীমটা দিয়ে তুলে ফেলা যেতে পারে। এছাড়া পুকুরের পরিবেশ উন্নয়ন তথা পুকুর পরিচর্যার জন্য পরিমিত পরিমাণে পটাশিয়াম পারম্যাঙানেট বা পাথুরে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১০. মাছের উকুন(আরেগুলোসিস)

মাছের গায়ে, ফুলকাতে ও আঁইসের ফাঁকে আরগুলাস নামক এক প্রকার পরজীবী দ্বারা মাছ আক্রান্ত হতে দেখা যায় । এই পরজীবী উকুনটি ডিম্বাকৃতি ও সামান্য চ্যাপ্টা ধরনের হয়। পেটের দিকে জোড়া চাকতির মত চুষনী দ্বারা মাছের আইসের নীচে চামড়ার সংগে আটকে থাকতে দেখা যায়। এদেরকে খালি চোখেও দেখা যায়। এ পোকার আক্রমণে মাছ অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করে ও যে কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে লক্ষ্য করা যায়। মাছের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার

শতকরা আড়াই ভাগ লবণ দ্রবণে মাছ যতক্ষন সহ্য করতে পারে ততক্ষন ডুবিয়ে রাখলে উকুন গুলি নিস্তেজ হয়ে পড়লে চিমটা বা হাত দিয়ে উকুন মাছের শরীর হতে সরিয়ে ফেলতে হবে। ০.৫ পি.পি. এম হারে ডিপট্যারেক্স সপ্তাহে ১ বার করে পর পর তিন সপ্তাহ পুকুরে প্রয়োগ করলে উকুনগুলি সম্পূর্ণরূপে মারা যাবে বলে আশা করা যায়। এ রোগে অত্যধিক পরিমাণে মাছ আক্রান্ত হলে পুকুর হতে সম্পূর্ণরূপে মাছ সরিয়ে নিয়ে পুকুর পানিশূণ্য করে পুকুরের তলা খুব ভালভাবে রোদে শুকাতে হবে এবং পুকুরের তলায় প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

১১. গিলফ্লুক (ডেকটাইলোগাইরোসিস)

ডেকটাইলোগাইরোস নামক এক প্রকার ব কোষী পরজীবী কর্তৃক মাছের ফুলকায় আক্রমণের মাধ্যমে এ রোগের সৃস্টি হয়। এ জাতীয় রোগে ফুলকা ফুলে যায় ও রক্তক্ষরণ হয়। মাছের ফুলকা ও শরীরের রং ফ্যাকাশ হয়ে যায় । মাছের শ্বাসঃপ্রশ্বাসের হার দ্রুত বেড়ে যায় এবং মাছ মারা যেতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রীস্মকালে কার্প জাতীয় মাছে বেশি মাত্রায় এ রোগ দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার

শতকরা ৩ ভাগ লবণ দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ১৫ মিনিট গোসল অথবা ৫০ পি.পি.এম ফরমালিনে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত মাছকে গোসল করাতে হবে।

১২. স্কিনফ্লুক (গাইরোডেকটাইলোসিস)

গাইরোডেকটাইলাস নামক এক প্রকার পরজীবী জীবাণুর আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগ সাধারণতঃ মাছের শরীরের চামড়া, পাখনা ও ফুলকায় হতে দেখা যায়। আক্রান্ত মাছের রং প্রাথমিক পর্যায়ে বিবর্ণ ও পরবর্তী পর্যায়ে ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে।

পাখনা কুচকিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ছিড়ে যায়। মাছের আইস ফুলে গিয়ে লাল হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত মাছ ছটফট করতে থাকে ও বিভিন্ন বস্তুর সাথে গা ঘষতে থাকে এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত মাছের চোখ ঘোলা হওয়াসহ অন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায় । বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছের বেলায় এ রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

প্রতিকার

আড়াই হাজার ভাগ পানিতে এক ভাগ ফরমালিন মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে আধ ঘন্টা গোসল করালে মাছ রোগমুক্ত হবে অথবা দুই হাজার ভাগ পানিতে এক ভাগ এ্যামোনিয়া মিশিয়ে দশ মিনিট কাল আক্রান্ত মাছের গা ধোয়ালে রোগ ভাল হবে। রোগের আক্রমণ বেশি দেখা দিলে পুকুরে ভাল পানি সরবরাহ করতে হবে। এবং পর্যায়ক্রমে পুকুর হতে মাছ অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।

১৩. ট্রাইকোডিনিয়াসিস

নার্সারী ও পোনা প্রতিপালন পুকুরে সাধারণত ঃ এ রোগ দেখা যায় । এ রোগের আক্রমণে মাছ অস্বাভাবিক ভাবে যত্রতত্র বিচরণ করতে থাকে। মাছের শরীরে ও ফুলকায় গোলাকৃতি হলুদে আকারের দাগ দেখা যায় মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যেতে লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকার

রোগাক্রান্ত মাছের পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগে জীবাণুমুক্ত হবে। এ রোগে আক্রান্ত মাছকে ৫০ পি.পি. এম ফরমালিন দ্রবণে সপ্তাহে অন্তত ঃ ১বার ২৪ ঘন্টা মাছকে গোসল করাতে হবে।

১৪. মিক্সোবলিয়াসিস্

মিক্সোবলিয়াসিস নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়ার আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগে মাছের ফুলকার উপর সাদা বা বাদামী রংয়ের দাগ দেখা দেয়। মাছের শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও অস্বাভাবিক ঘোরা ফেরা করে । রোগাক্রান্ত মাছের ফুলকায় ঘা হতে দেখা যায়।

প্রতিকার

এ রোগে আক্রান্ত মাছকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। বেশি আক্রান্ত মাছ নিধন করে ফেলাই উত্তম । পুকুরের পানি সম্পুর্ণরুপে অপসারণ করে পুকুরের তলায় পরিমিত হারে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর জীবাণুমুক্ত করে পুনরায় মাছ চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫. পুষ্টির অভাব জনিত রোগ

বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবে মাছের নানা প্রকারের রোগ দেখা দেয় । ভিটামিন 'এ' এর অভাবে মাছের চোখ অন্ধ হতে পারে। ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। ভিটামিন ই এর অভাবে শরীরে তরল পদার্থ জমে যায়, ভিটামিন কে এর অভাবে ক্ষত স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে না এবং বিটামিন বি এর অভাবে মাছ ভারসাম্যহীনতায় ভোগে। এ সকল রোগে আক্রান্ত মাছকে খাবারের সাথে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নির্দিষ্ট ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশিয়ে খাওয়ালে শারীরিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। তাই মৎস্য উৎপাদনের সার্বিক স্বার্থে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে সম্পুরক খাদ্য প্রদান অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাছের রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উওম । কিছু সর্তকতামূলক ব্যবস্থা ও সঠিক ব্যবস্থপনার মাধ্যমে চাষকৃত পুকুরে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সুস্থসবল মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে আশানুরূপ ফলন লাভের স্বার্থে নিম্নোক্ত শর্তাবলী মেনে চলা সমীচিন।

১. জলাশয়ের চাষোপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা, বিশেষ করে মাটি ও পানির গুণাগুণ প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

২. পুকুরের উৎপাদন শক্তি ও মাছ ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জলাশয়ে সঠিক মাত্রায় সুস্থ্য সবল উন্নত জাতের পোনা

মাছ মজুদ করণ।

৩. পুকুরটি হতে হবে খোলামেলা ও আগাছামুক্ত ।

৪. প্রচুর সূর্যালোক, বাতাস, অক্সিজেন ও পি এইচ এর সঠিক পরিমাণে পুকুরের পানিতে বিদ্যমান থাকতে হবে।

৫. পুকুরে কোন অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকারক প্রাণী থাকবে না।

৬. গাছের পাতা পানিতে পচে পানিতে দ্রবীভুত অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটতে পারে এমন ধরনের পাতাযুক্ত বড় গাছপালা

পুকুর পাড়ে থাকবে না।

৭. পুকুরে নিয়মিতভাবে পরিমিত হারে বিভিন্ন প্রকারের সার ও সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে অথবা পরিচর্যার সময়ে মাত্রাতিরিক্ত সার বা বিষ যাতে প্রয়োগ করা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৯. পুকুরের পানি ৩/৪ বৎসর অন্তর সেচ দিয়ে সম্পুর্নরুপে শুকিয়ে আশানুরুপ মাছ উৎপাদন উপযোগী করে তুলতে হবে।

১০. বছরে ২/৩ বার পুকুরে পাথুরে চুন ব্যবহার করে রোগ জীবাণু মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

১১. মাসে অন্তত ঃ ১ বার জাল টেনে মাছের শারীরিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

১২. মজুদ মাছের সংখ্যা ও পুকুরের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সব সময়ই কিছুটা ব্যবধান রাখা দরকার।

১৩. মাঝে মাঝে প্রয়োজনানুযায়ী আহরণযোগ্য কিছু কিছু মাছ ধরে বিক্রি করে সমহারে বড় আকারের মাছ মজুদ করতে হবে।

১৪. বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ চাষ পদ্ধতিগত ভাবে পরিচালনা করা হলে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ব লাংশে কমে যাবে এটি নিঃসন্দেহে বলা চলে ।

প্রযুক্তি হস্তান্তরে গণমাধ্যমের ভূমিকা

মোঃ আমিনুল ইসলাম
তথ্য অফিসার
মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

যোগাযোগ বলতে তথ্যের আদান-প্রদানকে বুঝায়। যোগাযোগ একটি গতিশীল ও অবিরত প্রক্রিয়া। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু নিয়ামক বা উপাদান থাকে। এসব উপাদান বা নিয়ামক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট ধরণের পরিস্থিতি বা ফলাফলের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কী পরিমাণ তথ্যের আদান-প্রদান ঘটল, কী তথ্যের আদান-প্রদান ঘটল এবং কখন তথ্যের আদান-প্রদান ঘটল, এসবই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নিয়ামক; এসব নিয়ামক পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন সমন্বয়ে মিথস্ক্রিয়া করে। একটি আদর্শ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে। যথা- তথ্যের উৎস, তথ্য, মাধ্যম এবং গ্রাহক।

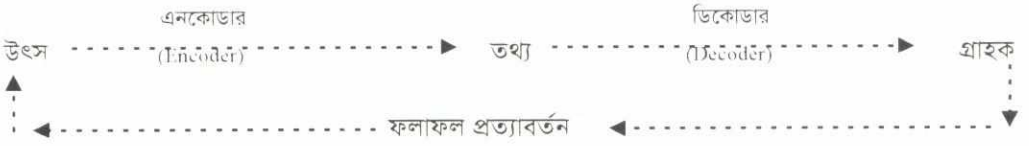

গণযোগাযোগ বলতে একই সময়ে অনেকের সংগে যোগাযোগ স্থাপনকে বুঝায়। যে প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক পদ্ধতিতে একই সংগে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী বহু সংখ্যক ও অসম প্রকৃতির গ্রাহক বা দর্শকের উদ্দেশ্যে সাধারণ কোন তথ্য প্রস্তুত ও প্রচার বা প্রেরণ করে তাকে গণযোগাযোগ বলা হয়।

গণযোগাযোগের বৈশিষ্ট্য

তথ্যের উৎস	প্রতিষ্ঠানিক, সাধারণভাবে কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান।
বিষয়	নৈর্ব্যক্তিক, সুসংগঠিত, একই সংগে বহু সংখ্যক গ্রহণকারীকে প্রদান করা হয় ।
হস্তান্তর প্রক্রিয়া	যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা- রেডিও-টিভি সিগনাল, মুদ্রিত শব্দ, চিত্র ইত্যাদি।
গ্রহণকারী	বহু সংখ্যক, বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো-ছিটানো এবং অসম।
ফিড ব্যাক	সাধারণত পরোক্ষ, বিলম্বে প্রাপ্ত।

গণমাধ্যম সমাজ ব্যবস্থার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর ভূমিকা ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। ভাল অথবা মন্দ যাই হোক, গণমাধ্যম আমাদের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। গণমাধ্যমের উপস্থিতি এবং এর বিষয়বস্তুর ওপর আমাদের নির্ভরতা একে আমাদের জীবনযাত্রায় অত্যাবশ্যকীয় এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মূল বিষয় হলো উন্নয়ন তথ্য প্রদান। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর। প্রযুক্তি হস্তান্তর হলো একটি সফল যোগাযোগ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বিষয়ভিত্তিক কারিগরি তথ্য, ধারণা ও দক্ষতা একের নিকট হতে অন্যের নিকট স্থানান্তরিত হয়। কোন কারিগরি তথ্য যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণকারীর নিকট যথাযথ হিসেবে প্রতীয়মান না হয়, জনগণের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ হিসেবে গৃহীত না হয় এবং বাস্তবে এর প্রয়োগ না

ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন মূল্য নেই। অনুরূপভাবে সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান ও তথ্য গ্রহণকারীর মধ্যে কারিগরি তথ্যের আদান-প্রদানকেও প্রযুক্তি হস্তান্তর বলা হয়।

প্রযুক্তি হস্তান্তরে কেন গণমাধ্যম

বিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে যান্ত্রিক উৎকর্ষতা তথ্য প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর অকল্পনীয় কারিগরি উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও বাজার অর্থনীতি ও সীমিত সম্পদ -এই দুটি দিক বিবেচনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সম্প্রসারণ কর্মী নিয়োগের সুযোগ আমাদের দেশে নেই। গণমাধ্যম সীমিত সম্পদের বিনিয়োগে খুব দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব সংখ্যক লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। সুতরাং প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে গণমাধ্যম প্রথম বিবেচনায় আসতে পারে।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলসম্পদে সমৃদ্ধ। বিস্তীর্ণ এ জলসম্পদ লাভজনক ভাবে চাষোপযোগী বিভিন্ন মাছের উত্তম আবাসস্থল। খুব সম্ভবত বাংলাদেশের মত আয়তনের কোন দেশই ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুগত দিক বিবেচনায় এতটা মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। আমাদের রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় এবং ১৩ লক্ষাধিক দিঘি-পুকুর। মাছ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাপ্য আমিষের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। জাতীয় পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রযুক্তি হস্তান্তরে গণমাধ্যম

এ বিষয়ে সন্দেহের বা প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যে, গণমাধ্যমের ভূমিকা হবে প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রচার ও তথ্য প্রদান। এক্ষেত্রে মূখ্য বিবেচ্য বিষয় হলো সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রচারের ধরন কি রকম হবে?

অর্থাৎ
- কী প্রচারিত হবে ?
- প্রচারের ব্যাপ্তি কতটা বিস্তৃত হবে ?
- কেমন করে প্রচারিত হবে ? এবং
- প্রচারের ধরন-ধারণের কতটা নিয়ন্ত্রিত হবে ?

বস্তুতপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মাছ চাষ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে জনপ্রিয় সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রযুক্তি হস্তান্তরে গণমাধ্যমের ভূমিকা হবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গণ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ। গণসচেতনতা বলতে কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অবহিত হওয়া এবং তা কার্যকররূপে প্রতিপালিত হওয়ার তাগিদকে বুঝায়। অর্থাৎ জানা এবং মানার সমন্বয়ই হলো স্বার্থক গণসচেতনতা।

অন্যান্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ন্যায় মৎস্য ক্ষেত্রে উন্নয়নও একটি গতিশীল ও অবিরত প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রযুক্তিগত অবস্থান একটি দেশের উন্নয়ন দর্শনকে প্রভাবিত করে; ক্ষেত্র বিশেষে নিয়ন্ত্রণও করে। তাই গণমাধ্যমের প্রচারণা কার্যক্রমে এসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

'ধরিব মৎস্য, খাইব সুখে,
কি আনন্দ লাগছে বুকে' -এই হলো আমাদের মাছ সম্পর্কিত ঐতিহ্য। সুতরাং বর্তমান সময় নতুন ঐতিহ্য স্থাপনের। আমাদেরকে শুধুমাত্র মাছ ধরে খাওয়ার ঐতিহ্য ভেঙ্গে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও মাছ চাষের ঐতিহ্য স্থাপন করতে হবে। এজন্য গণমাধ্যমে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরতে হবে এবং সাথে সাথে দেশে মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা ও এ সম্ভাবনা উৎসারিত করা গেলে তা জাতীয় উন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখবে, তা প্রচার করতে হবে। জাতীয় জীবনে মৎস্য সম্পদের ইতিবাচক দিক সহজেবোধ্য করে সুস্পষ্টভাবে গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। বিগত তিন-চার দশক থেকে মাছ চাষের নামে নামমাত্র বা সৌখিন মাছ পালনের একটা প্রক্রিয়া চলে আসছে। গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে মাছ চাষ বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায়, বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ পদ্ধতি এবং এরূপ চাষে লাভের সম্ভাবনা কত বেশি।

গণমাধ্যমে প্রযুক্তির কতটুকু প্রচারিত হওয়া উচিৎ

উন্নয়ন প্রক্রিয়া সময়কাল এবং সমাজ কাঠামোর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এজন্য সময়ের দাবী এবং সামাজিক চাহিদার আলোকে উন্নয়ন দর্শন নির্ধারণ করতে হবে। বিদ্যমান সম্পদের আলোকে বর্তমান চাহিদাকে প্রধান্য দিয়ে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রযুক্তির বিশেষ ক্ষেত্র সমূহ প্রচারিত হওয়া উচিৎ। একই সাথে প্রচার করতে হবে কারা, কীভাবে চিি ত এসব বিশেষ ক্ষেত্রসমুহে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রযুক্তি তথ্য প্রচারের জন্য সময়ের সীমিত পরিসর বা মুদ্রিত মাধ্যমের প্রতিযোগিতামূলক স্থানের স্বল্পতার কারণে গণমাধ্যমে প্রযুক্তির কারিগরি দিক বা প্রায়োগিক পদ্ধতির খুটিনাটির দিকে না যাওয়াই ভাল। কারণ গণমাধ্যমেও স্বল্প পরিসরে, বিশেষ করে অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে প্রযুক্তির খুটিনাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তির কাট-ছাট প্রচার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মনে দুর্বোধ্যতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে পুরো বিষয়টির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশংকা থাকে।

ধরা যাক, রুইজাতীয় মাছের উন্নত চাষ পদ্ধতি শীর্ষক প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য গণমাধ্যমে প্রচার চালানো হবে। আমরা জানি রুইজাতীয় মাছের উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনায় একর প্রতি ২ টন মাছ সহজেই উৎপাদন করা সম্ভব; যেখানে সাধারণ চাষে একর প্রতি মাত্র ০.৫০ টন মাছ উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছ চাষে লাভজনক সম্ভাবনার কথাই জোর দিয়ে বলতে হবে। প্রযুক্তির কারিগরি দিক ততটা নয়। কারণ প্রত্যাশিত উৎপাদন পেতে হলে কোন প্রযুক্তির কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত দিকসমূহের প্রতিটি বিষয় যথাযথভাবে অবহিত হওয়া, আত্মস্থ করা এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন; যা কোন গণমাধ্যমের স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয় এবং বুঝানো সম্ভব নয়। আবার প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি পছন্দ বা নির্বাচন আগ্রহী ব্যক্তির আর্থিক সংগতি ও সামাজিক অবস্থানের ওপরও নির্ভর করে। সে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পছন্দকৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে গণমাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ বা প্রদর্শন সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় কোন পরীক্ষিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্তরূপ প্রচার করা হলে তা অনুসরণের ফলে বর্ণিত উৎপাদন না পাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। সেক্ষেত্রে উক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে হতাশা ও অবিশ্বাস জন্মাতে পারে। এতে করে লাগসই কোন প্রযুক্তি বা বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনমনে হতাশার সৃষ্টি হতে পারে। ফলে পুরো সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে।

সুতরাং গণমাধ্যমে প্রযুক্তির সম্ভাবনার দিক তথা অধিক উৎপাদনশীলতা, অধিক আর্থিক লাভ ইত্যাদি তথ্য প্রচার করা যেতে পারে। সেই সাথে উক্ত প্রযুক্তি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের বিস্তারিত পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল কোথা থেকে জানা যাবে, কোথায় গেলে প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে, প্রযুক্তি বাস্তবায়নের উপকরণ কোথায় পাওয়া যাবে এসব তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রচার করতে হবে।

কোন প্রযুক্তি প্রচার হওয়া উচিৎ নয়

গণমাধ্যমের প্রচারিত বিষয়বস্তু একই সংগে অসংখ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এজন্য গণমাধ্যমে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রসংগের অবতারণা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। কোন গোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি করে এরূপ কোন প্রযুক্তি গণমাধ্যমে প্রচার করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। যেমন- মানুষের মল প্রয়োগে মাছ চাষ ভারতে একটি সফল প্রযুক্তি হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক ঐতিহ্যের কারণে এ প্রযুক্তি বাংলাদেশে সম্প্রসারণ সম্ভব নাও হতে পারে।

গণমাধ্যমে প্রযুক্তি তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তঃসেক্টর দ্বন্দ্বও প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমন, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের নামে যত্র-তত্র বাঁধ নির্মাণের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এরূপ তথ্য প্রচার করা হলে সরকারি কার্যক্রমের যথার্থতা সম্পর্কে জনমনে অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে। গণমাধ্যমে কোন প্রযুক্তি তথ্য প্রচারের পূর্বে প্রচারের উপযোগীতা ও যথার্থতা যাচাই করে নেওয়া উচিত। এজন্য তথ্য অবমুক্তি সেল (Information Clearing Cell) গঠন করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি তথ্য প্রচারের কৌশল

গণমাধ্যম একই সংগে ব সংখ্যক, বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী অসম দল বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এক্ষেত্রে তথ্য গ্রহণকারীর বয়স, শিক্ষা , তথ্য উপলব্ধির মাত্রা, ধর্ম, গোত্র ইত্যাদি বিবেচনা করার কোন অবকাশ থাকে না। একারণে উদ্ভাবিত কোন বিশেষ প্রযুক্তি বা অধিক কারিগরি তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার করা যথার্থ হবে না। কোন বিশেষ প্রযুক্তি গণমাধ্যমে প্রচার করতে হলে তা সাধারণীকরণ করতে হবে। গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য একই সংগে শিক্ষামূলক ও উপভোগ্য হতে হবে।

প্রযুক্তি তথ্য উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য নিম্নরূপ বিষয়গুলো প্রচারিতব্য প্রযুক্তির সাথে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারেঃ

১. বাস্তব কোন ঘটনা সংক্ষিপ্ত করে যোগ করা যেতে পারে।
২. ধর্মগ্রন্থ থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ঘটনা যোগ করা যেতে পারে।
৩. মনোরঞ্জন ও রসাত্মক ব্যঞ্জনা যোগ করা যেতে পারে।
৪. চমকপ্রদ সফল কাহিনী সংযোজন করতে হবে।
৫. কারিগরি পরিভাষা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
৬. পরিপাটি করে প্রচার করতে হবে।
৭. প্রচারিত তথ্যে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

প্রচারের ব্যাপ্তি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গণমাধ্যমে প্রযুক্তির সম্ভাবনা গুরুত্বসহকারে প্রচার করা উচিৎ, প্রযুক্তির কারিগরি দিক পুরোপুরি নয়। কারিগরি দিক নিম্নরূপ উপায়ে প্রচার করা যেতে পারে ঃ

- প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও উপযোগিতা বর্ণনা করে।
- প্রযুক্তির বিস্তারিত জানা যাবে এমন প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট ঠিকানা বর্ণনা করে।
- প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য উপকরণাদি প্রাপ্তির একাধিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ঠিকানা প্রদান করে।
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগীতার ধরন উল্লেখ করে।
- প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কারা এবং কিভাবে তাঁ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হতে পারেন তা বর্ণনা করে।
- প্রযুক্তি বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বর্ণনা করে।

উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও প্রচারিত বিষয় যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কোন ক্রমমাত্রা (range) উল্লেখ করা উচিত নয়। যেমন- পুকুরের প্রতি শতকে ২০-৫০টি পোনা ছাড়া যেতে পারে। এরূপ তথ্য প্রচার না করে বরং বলা যেতে পারে প্রতি শতকে ৩০ টি পোনা ছাড়বেন। যদি ২০-৫০ টি পোনা ছাড়ার তথ্য প্রচার করা হয়, তাহলে কোন অবস্থায় বা

কোন প্রযুক্তিতে ২০টি বা ৪০টি বা ৫০টি পোনা ছাড়া যাবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ সংখ্যায় এই তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। যাতে করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাকে কতটি পোনা ছাড়তে হবে। অন্যথায় এরূপ তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণকারীকে দ্বিধায় ফেলে দিতে পারে।

কোন মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত

বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার বিবেচনায় অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম অধিকতর উপযোগী। অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম একই সঙ্গে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লক্ষ্য-জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমের মধ্যে ভিডিও মাধ্যম অধিকতর কার্যকরী। ভিজুয়াল মাধ্যমে গ্রহণকারী দর্শনেন্দ্রীয়ের সাহায্যে কোন তথ্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। উল্লিখিত মাধ্যমদ্বয়ের পাশাপাশি মুদ্রিত মাধ্যম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুদ্রিত মাধ্যমে কোন প্রযুক্তি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায়। সুতরাং দেশে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিও-ভিজুয়াল এবং মুদ্রিত মাধ্যম একই সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য এই তিনটি গণমাধ্যমই যুগপৎ কাজে লাগানো যেতে পারে।

নিচের সারণিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্যের স্মৃতিতে স্থিতিকাল বা স্থায়িত্ব উল্লেখ করা হলো ঃ

গণমাধ্যম	স্মৃতিতে তথ্যের স্থিতিকালের প্রকৃতি	মাধ্যমের উপযোগীতা/অনুপযোগীতা
অডিও	অল্প সময় স্মরণ থাকে	দেখা যায় না
মুদ্রণ	অডিও মাধ্যমের চেয়ে অধিক সময় স্মৃতিতে স্থায়ী হয়	অশিক্ষিত লোক পড়তে পারে না
অডিও-ভিজুয়াল	স্মৃতিতে দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে	একই সঙ্গে দেখা ও শোনা যায় দেখার ফলে বিশ্বাস স্থাপন হয়

তথ্য গ্রহণের পর অতিক্রান্ত সময়	গণমাধ্যমের প্রকৃতি অনুযায়ী তথ্যের স্থিতি (%)		
	অডিও	মুদ্রণ	অডিও-ভিজুয়াল
৩ ঘন্টা	৭০-৭৫	৮০	৯০
৩ দিন	৩৫	৪০	৮০
৩ সপ্তাহ	৫	১০	৬০

উপসংহার

মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনাকে উৎসারিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের সাহায্যে সফলভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য লক্ষ্য-জনগোষ্ঠী নির্ধারণ করে তাদের প্রযুক্তি চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান উপলব্ধি করার মাত্রা পূর্বানুমান করতে হবে। অতঃপর এর ভিত্তিতে প্রযুক্তি বাছাই করে মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে। এজন্য বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সংশ্লিষ্টতা এক্ষেত্রে পূর্বশর্ত। মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের মধ্যে টেকসই বন্ধন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

আদর্শ মৎস্য গ্রাম ঃ একটি সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণ কার্যক্রম

ওয়াহিদুন নবী,
প্রকল্প পরিচালক, এন.এফ.ই.পি
মোহেরুল ইসলাম,
সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এন.এফ.ই.পি

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি জনব ল উন্নয়ণশীল দেশ যার অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে কৃষি ভিত্তিক। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য চাষ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে এদেশের ৬০ ভাগ পুষ্টি আসছে মাছ থেকে। এছাড়া মৎস্য সাবসেক্টরে ১.৪ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষভাবে ও ১১ মিলিয়ন লোক পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। মাছের মোট উৎপাদন বাড়লেও সময়ের বিবর্তনে নানাবিধ কারণে বর্তমানে মাছের জন প্রতি প্রাপ্যতা কমেছে। কারণ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মাছের উৎপাদন মাত্রাসরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হয়নি, যদিও মাছ উৎপাদনের একক হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিপুল জলসম্পদে ভরা বাংলাদেশের ২,৯৭,৪০৪ হেক্টর বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ সম্প্রসারিত করা গেলেই কেবল মাত্র স্থিত উৎপাদন ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি করে আগামী দিনে মাছের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বিশিষ্ট মৎস্য বিজ্ঞানীদের মতে কোন দেশের মৎস্য উৎপাদন তিন ভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে যা হলো-প্রথমত স্থিত সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত নিবিড় পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে, তৃতীয়ত চাষযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে।

উল্লিখিত ত্রিমুখী কৌশলের সবগুলির প্রয়োগেই প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান কিংবা কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণ সেবা সম্প্রসারিত করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশে বিশেষত মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে একক পদ্ধতি (Individual approach) অধিকতর চালু রয়েছে যেখানে শুধু মাত্র একজন মৎস্যচাষী/খামারী সম্প্রসারণ সেবা পেয়ে থাকেন। বদ্ধ জলাশয়ের শুধুমাত্র ১৩ লক্ষ পুকুর মালিকের কাছে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কত সময় লাগতে পারে সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশ সমূহের রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা, জনবলের তথা সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ইদানিংকালে দলভিত্তিক (Group approach) ও গোষ্ঠীভিত্তিক (Community based approach) সম্প্রসারণ সেবার কথাই আলোচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালায় দল/গোষ্ঠী ভিত্তিক সেবার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এ যাবৎকাল বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম গুলির মধ্যে আদর্শ মৎস্য গ্রাম একটি ভিন্নতর সম্প্রসারণ কার্যক্রম পদ্ধতি যা উত্তর পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। যার ২টি বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথমত এটি একটি গোষ্ঠীভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বিতীয়ত এ পদ্ধতিতে চাষী/খামারীকে ঋণ প্রদান/অর্থ যোগান ছাড়াই চাষী/খামারীকে মৎস্য চাষ কার্যক্রমে আগ্রহী করে তোলা হয়।

আদর্শ মৎস্য গ্রাম স্থাপন কার্যক্রম মূলতঃ গ্রামের সকল মাছচাষীদের সমন্বয়ে তাদের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে যেখানে সম্প্রসারণ কর্মী গৌণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে যে কোন সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে হলে ৪ টি বিষয়ে সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয় যা হলো পরিকল্পনা (Planning) ও কার্যক্রম বাস্তবায়ণ (Implementation), কার্যক্রমের সুফল আদান প্রদান (Sharning of benefits) ও কার্যক্রম মূল্যায়ণ (Evaluation) যা আদর্শ মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব।

সমাজ উন্নয়ন ভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের কিছু সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং অল্প খরচে অনেক মাছ চাষীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।
- সকল মৎস্যচাষী মাছ চাষে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।
- সমাজ ভিত্তিক চেতনা এলাকার চাষীদের নিত্য নতুন ধারনা ও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, স্বনির্ভরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখে।
- মৎস্য চাষীরা সরাসরি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ফলে গৃহীত সম্প্রসারণ কার্যক্রম উপযুক্ত ও বাস্তব রূপ লাভ করে।
- মাছ চাষ ব্যতিত অন্যান্য সমস্য সমাধানে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে।
- সামাজিক উন্নয়নের ছোয়া ব্যক্তি কেন্দ্রিক না হয়ে সমাজে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে বিস্ফোরিত হওয়ার উজ্জলতর সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।
- মাছ চাষের কিছু নিয়ম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যেমন, জাল টানা কিংবা পুকুর শুকানো ইত্যাদি কম খরচে সময়মত সম্পাদনে উৎসাহিত করে।

  গ্রামের সকল পুকুর মালিক একইসাথে মাছ চাষে নিবিড় হওয়ার ফলে মাছ চুরির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

আদর্শ মৎস্যগ্রাম বাস্তবায়ন ধারাবাহিক কর্ম পদ্ধতি

১. গ্রাম নির্বাচন ঃ (সম্ভাব্য মাস ঃ জানুয়ারী)

আদর্শ মৎস্য গ্রাম নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা দরকারঃ

- পর্যাপ্ত পুকুর থাকা (১৫-৩০)টি।
- পোণা ব্যবসায়ীর উপস্থিতি।
- উক্ত গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে নার্সারীর বা পোণা বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকা সুবিধাজনক।
- গ্রাম্য ক্লাব বা সমিতিভিত্তিক অন্য কোন কার্যক্রমের উপস্থিতি।
- স্থানীয় নেতৃবৃন্দ/গ্রামবাসীর মৎস্যগ্রাম স্থাপনে আগ্রহ।
- থানা মৎস্য অফিসের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

  মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল কিংবা বর্তমানে চলছে এমন গ্রাম নির্বাচন করা ।

২. গ্রামের পুকুর মালিকদের মৎস্য গ্রাম স্থাপনের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রথম সভা ঃ (সম্ভাব্য মাস ঃ মার্চ)

সভার মূল উদ্দেশ্য

- সকল পুকুর মালিকগণকে একত্রীকরণ।
- মাছ চাষের সম্পদ,সম্ভাবনা চিহ্নিত করণ ও মাছ চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ।
- গোষ্ঠীভিত্তিক কাজের সুফল তুলে ধরা, নিজস্ব গ্রামকে মৎস্য গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করণ।
- পুকুর মালিকদের মাঝ থেকে দলীয় পরামর্শক নির্বাচন এবং তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা ।
- স্থানীয় প্রতিনিধিদেরকে মৎস্য গ্রাম স্থাপনে সম্পৃক্ত করণ।
- থানা মৎস্য অফিস ও জেলা মৎস্য অফিসের সহায়তার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।
- মৎস্য ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা।

  প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা ।

দলীয় পরামর্শকের কাজ/ভূমিকা

- দলীয় পরামর্শক উদ্যোগীগণ যুবক, মাছ চাষের পূর্ব অভিজ্ঞ গ্রামের লোকদের আস্থাভাজন কোন ব্যক্তি হতে পারেন। স্বল্পশিক্ষিত বা শিক্ষিত হলে সুবিধাজনক।
- মৎস্য অফিস আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম শেষ হলেও উক্ত দলীয় পরামর্শকগণ গ্রামের অধিবাসী এবং দীর্ঘদিন গ্রামেই থেকে যাবেন। তারা গ্রামবাসীকে পরামর্শ দিবেন এবং মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- দলীয় পরামর্শক, কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে থানা মৎস্য কর্মকর্তা পরিদর্শনকালের সমস্ত পরামর্শ দলের অন্যান্য পুকুর মালিকদের বুঝিয়ে বলবেন।
- সভা,প্রশিক্ষণ, চাষী সমাবেশ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মূল আয়োজকের ভূমিকা রাখবেন।
- রেকর্ড বুক লেখা ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- ম্যানুয়াল , লিফলেট ইত্যাদি অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিতরা না বুঝলে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন।
- পোণা মজুদ, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদির সময় বিশেষ ভাবে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা রাখবেন।

মৎস্য ক্লাব স্থাপন

মৎস্য ক্লাব স্থাপন গ্রাম পর্যায়ে মৎস্যচাষের গুরুত্বের প্রতি সমমনাদেরই একটি সংঘ যা মৎস্য চাষের বিভিন্ন তথ্য, দ্রব্যাদি, মাছ চাষের সরঞ্জাম নিজেদের উদ্যোগে সংরক্ষণ করবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয়ভাবে ভূমিকা রাখবে। মৎস্য ক্লাব স্থাপনের নিম্নলিখিত সুবিধাদি গ্রামবাসীগণ পেতে পারেন।

- পুকুরমালিকগণ নিজেদের উদ্যোগে একটি ঘর তুলতে পারেন যেখানে তারা অবসরে বসে আলোচনা, পরামর্শ করতে পারেন।
- ক্লাবে মাছচাষ সংক্রান্ত সহায়ক তথ্যাদি যেমন ঃ বুকলেট, ম্যানুয়াল , লিফলেট, পোষ্টার অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- এছাড়াও চাষীরা নিজেদের উদ্যোগে দলীয় ব্যবহারের জন্য টানজাল, পাম্প মেশিন, হাপা ইত্যাদি ক্রয় করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- মৎস্য চাষ সম্পর্কীয় আলোচনা ছাড়াও অন্যান্য সমাজসেবা মূলক আলোচনা/অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. জরিপ কার্য সম্পাদনা (সম্ভাব্য মাসঃ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যেই)

আদর্শ মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের শুরু ও শেষ হওয়ার পর পুকুর মালিকদের উন্নয়ন (মৎস্য চাষ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন) নিরূপনের নিরূপক হিসাবে এই তথ্য কাজে লাগানো হবে। কার্যক্রম শেষে যখন গ্রামের মৎস্য চাষের অবস্থার উন্নতি মূল্যায়ন করা হবে তখন এই তথ্য বেসলাইন সার্ভে রিপোর্ট হিসাবে কাজে লাগানো হবে। এই তথ্য থানা মৎস্য দপ্তর প্রকল্প থেকে নির্ধারিত ছক মোতাবেক সংগ্রহ করবে।

৪. প্রশিক্ষণ

- একটি গ্রামে নানা ধরণের পুকুর থাকতে পারে যেমন ঃ ছোট,বড়, মৌসুমী, বাৎসরিক, নালা জমি সংলগ্ন পুকুর। তাই বিভিন্ন ধরণের জলসম্পদের ভিত্তিতে একটি সাধারণ আধা নিবিড় মাছচাষের পদ্ধতি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হবে। তবুও বিশেষ করে প্রজাতি নির্বাচনের ব্যাপারে চাষীর চাহিদা অনুযায়ী মডেলের পরামর্শ দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোন চাষীর চাহিদা যদি খুবই ভিন্নতর হয় তবে তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তাদান করতে হবে।
- প্রশিক্ষণে শিক্ষণীয় তথ্য যাতে চাষীরা সহজে গ্রহণ করতে পারে এজন্য প্রশিক্ষণকে উপযুক্ত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তিনটি ধাপে ৩দিনে পুকুর পাড়ে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।
- ব্যবহারিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রথম ধাপে এপ্রিলে পুকুর প্রস্তুতি, ২য় ধাপে মে-জুন পোনা মজুদ ও মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা ও ৩য় ধাপে সেপ্টেম্বর মাসে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও আংশিক আহরণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান শুরু করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, এটা দেখা গেছে গ্রামের অনেক মহিলাই মাছ চাষের বিশেষতঃ খাবার যোগান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এ জন্য এ ধরনের কর্মসূচিতে পুকুর মালিকগণের স্ত্রী/বোন/মা এর প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব সহ মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল আলোচনার জন্য এক দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা দরকার।

৫. মাসিক সভা ও পুকুর পরিদর্শন

- প্রতি মাসে সকল পুকুর মালিকগণকে নিয়ে আদর্শ মৎস্য গ্রামে থানা মৎস্য কর্মকর্তা একটি মাসিক সভার আয়োজন করবেন।
- মাসিক সভায় প্রত্যেকে রেকর্ড বই প্রদর্শন করতে হবে।
- মাসিক সভায় পূর্ববর্তী মাসে করণীয় কাজের ওপর আলোকপাত এবং পরবর্তী মাসের পালনীয় বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন।
- সকল পুকুর মালিকগণকে নিয়ে কোন একটি পুকুরে জাল টেনে পর্যবেক্ষণ এবং ঐ পুকুরে মাছের উৎপাদন নিয়ে চাষীদের মাঝে তাদের অভিজ্ঞতা আলোকপাত করবেন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা যাপন নির্ধারণ করবেন।
- তিনটি প্রশিক্ষণ ধাপের মাসে কোন মাসিক সভার আয়োজন করা হবে না।
- চাষী সমাবেশে (যদি অনুষ্ঠিত হয়) সে মাসেও মাসিক সভা অনুষ্ঠানের দরকার নেই।

৬. চাষী সমাবেশ (সম্ভাব্য মাস ঃ সেপ্টেম্বর/অক্টোবর)

- প্রতিটি মৎস্য গ্রামে একটি করে চাষী সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।
- সমাবেশে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মৎস্য চাষ/উদ্যোগী খামারী/নার্সারী মালিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/জেলা/থানা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেম্বারগণকে নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।
- সমাবেশে মৎস্য গ্রাম স্থাপনের গুরুত্ব এবং এর ফলাফল নিয়ে আলোকপাত ও আলোচনা হবে।
- সমাবেশে একটি পুকুরে জাল টেনে মাছ পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করতে হবে।
- চাষী সমাবেশে , বর্ণাঢ্য তাবু, মাইকের ব্যবস্থা করা হবে।
- চাষী সমাবেশে গ্রাম পরিভ্রমণ করা যেতে পারে।

৭. রেকর্ড বই সংরক্ষণ

- প্রতিটি পুকুর মালিক একটি রেকর্ড বই সংরক্ষণ করবেন।
- সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ উক্ত রেকর্ড বহিতে মাছ চাষে উৎপাদন সংক্রান্ত পরামর্শ/করণীয় কাজ লিপি বদ্ধ করবেন যার জন্য বইটি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ও ফরমেট থাকবে।
- চাষীগণ উক্ত রেকর্ড বহিতে আয়/ব্যয় ও উৎপাদন হিসাব সংরক্ষণ করবেন।
- রেকর্ড বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থানা মৎস্য কর্মকর্তা অফিসে রিপোর্ট পাঠাবেন।

রিপোর্টিং ও মনিটরিং

- প্রথম সভার পর বেসলাইন সার্ভে বা জরিপকার্য সম্পাদনের পর উক্ত রিপোর্ট / প্রেরণকৃত ফর্মেট থানা মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্পে পাঠাবেন। জরিপ সম্পাদনের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মার্চ মাসের ৪র্থ সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই পাঠাতে হবে।
- পুকুর প্রস্তুতি ও পোনা মজুতের পর, জুন মাসের শেষে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের নির্ধারিত ফর্মেটে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্পে একটি রিপোর্ট পাঠাবেন।

- সম্পূর্ণ মাছ আহরণের পর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ হতে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের নির্ধারিত ফর্মেটে একটি সর্বশেষ রিপোর্ট অনুরূপভাবে পাঠাতে হবে।
- এছাড়াও জেলা মৎস্য অফিসের মাসিক সভায় থানা মৎস্য কর্মকর্তা সার্বিক অগ্রগতি ও সমস্যা আলোচনা করবেন।

আদর্শ মৎস্য গ্রামের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ

প্রতিটি মৎস্যগ্রামের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য বিভাগীয় সম্প্রসারণ সেবা ২য় বছরে প্রদান করা হবে।

১. রিফ্রেশার কোর্স আয়োজন ঃ (সম্ভাব্য মাস ঃ মার্চ-এপ্রিল)

যেহেতু পুরাতন (২য়) বছরে মৎস্য গ্রামে চাষীদের প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা নেই সেহেতু মৌসুমের গুরুত্বে পুকুর মালিকদের নিয়ে একটি রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করতে হবে, যেখানে যেখানে পূর্ববর্তী বছরে পুকুর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করা যেতে পারে।

২. পুকুর পরিদর্শন ঃ থানা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীগণ প্রতিমাসে একবার মৎস্য গ্রাম পরিদর্শন করবেন।

৩. ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠান ঃ ২য় বছরে মৎস্য গ্রামে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

- সভায় পূর্ববর্তী মাসগুলিতে করণীয় কাজের ওপর আলোকপাত ও পরবর্তী তিনমাসে পালনীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা করবেন।
- সভায় রেকর্ড বই পর্যবেক্ষণ, আলোচনা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৪. রেকর্ড বই সরবরাহ/সংরক্ষণ

আদর্শ মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য ২য় বছরেও রেকর্ড বই সরবরাহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. দ্বিবার্ষিক পর্যালোচনা সভা (সম্ভাব্য মাস ঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ)

- পর পর দুবছর পূর্বের মত মৎস্য গ্রাম পরিচালনার পর দ্বিতীয় বছরের শেষে একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।
- সভায় অর্জিত ফলাফলের নিরিখে পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে।
- পরবর্তী বছরের যাতে পুকুর মালিকগণ নিজেরাই আর্দশ মৎস্য গ্রামের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হবে।

আদর্শ মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের প্রাথমিক ফলাফল

১৯৯৫ সনে পরীক্ষামূলকভাবে উত্তর পশ্চিম মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প কর্তৃক মৎস্য গ্রাম স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রমে গ্রামের সকল পুকুর মালিকগণকে একত্রিত করে প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়। পরবর্তীতে মৎস্য চাষ ও পুকুর ব্যবস্থাপনার ওপর তিনধাপে উক্ত গ্রামে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সম্প্রসারণ কর্মীগণ মাসিক পরিদর্শনের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকেন। এই কার্যক্রমে মৎস্য চাষীদের প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়। প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, এক বছর সম্প্রসারণ সেবা সম্প্রসারণের ফলে চাষীদের মৎস্য উৎপাদন ২ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পরবর্তী বছর দেখা গেছে প্রায় সকল পুকুর মালিকগণ পুকুর মেরামতসহ পুকুর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য বিষয় যেমন-পুকুর প্রস্তুতি, মাছ মজুদ ইত্যাদি সার্বিকভাবে প্রতিপালনে দারুণভাবে যত্নবান হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া উক্ত কার্যক্রমের সফল

বাস্তবায়নে স্থানীয় মৎস্য চাষী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক চাষী, স্থানীয় প্রতিনিধি আদর্শ মৎস্য গ্রাম স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সনে প্রকল্প এলাকায় প্রায় মোট ১১৮ টি মৎস্য গ্রাম স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে প্রায় ২৯০০ জন পুকুর মালিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আদর্শ মৎস্য গ্রাম কার্যক্রম সহজবশ্যতা (Flexibility)থাকায় সম্প্রসারণ কর্মীগণের (Thana Fisheries Officer) কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বিধায় প্রতিটি থানায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার

আদর্শ মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পদের অভাব, অপ্রতুল জনবল সত্বেও একসাথে ছোট, বড় কিংবা ধনী গরীব অধিক সংখ্যক চাষী/খামারীর নিকট সম্প্রসারণ সেবা প্রসারের সুযোগ রয়েছে। এই কার্যক্রমে চাষী/খামারী স্থিত সম্পদ, মৎস্যচাষ সহায়ক সামগ্রীর যোগানের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেয়ার ফলে তারা নিজেদের স্থিত সম্পদ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুযোগ পেয়ে থাকে। আশা করা যাচ্ছে, মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত চাষ পদ্ধতি (পুকুর পাড়ে সবজির চাষ, ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ইত্যাদি) সমন্বয় ঘটিয়ে এ কার্যক্রমের কার্যকারিতা ব লাংশে বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া মৎস্যচাষ উন্নয়ন ছাড়াও গঠিত গোষ্ঠীভিত্তিক গ্রামের মাধ্যমে জনগণকে অন্যান্য যে কোন ধরনের উন্নয়ন মূলক সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দিতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর সমগ্র বাংলাদেশে থানা ভিত্তিক ২টি করে আদর্শ মৎস্য গ্রাম বাস্তবায়ন করা হলে গড়ে গ্রাম প্রতি ৩০ জন পুকুর মালিক ধরা হলে আনুমানিক ২৮ হাজার মৎস্যচাষী বা খামারীর সাথে প্রতি বছর সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে সম্প্রসারণ সেবা দেয়া সম্ভবপর। উল্লেখিত ২৮ হাজার জন চাষী বা খামারীর মাছের উৎপাদন দিগুণ বৃদ্ধি পেলে সর্বসাকুল্যে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মৎস্য বিষয়ক প্যাকেজ প্রযুক্তি

মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

পুকুর দীঘি থেকে আরম্ভ করে হাওড়-বাওড়, নদী-নালা ও বিল-ঝিলে পরিপূর্ণ এ বাংলাদেশ। এ ছাড়াও রয়েছে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলাশয়। এ অবারিত জলরাশির বিজ্ঞানভিত্তিক সুষ্ঠু জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিই হতে পারে দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। এ জলজ সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং মাছের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এ সেক্টর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, এ সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং মাছ ও চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের উপরই মৎস্য সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। কিন্তু এককভাবে কতিপয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি মৎস্য উৎপাদনে জড়িত হয়ে দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদামত মাছ উৎপাদন কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন তথা মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে মৎস্য সেক্টরে বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তা সৃষ্টি অন্যতম।

বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাগণ অত্যন্ত লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে মৎস্য সেক্টরে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে এবং আপামর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষিত লাগসই প্রযুক্তি সম্বলিত ২৩টি প্যাকেজ প্রণয়ন করেছে।

এ সব প্যাকেজের মধ্যে রুইজাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন, চাষ ও ব্যবস্থাপনা, পোনা প্রতিপালন এবং পোনা পরিবহন বিষয়ে বিস্তারিত প্রযুক্তিগত তথ্যাদিসহ ৪টি প্যাকেজ রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার এবং সহনশীল পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে গলদা ও বাগদা চিংড়ির উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গলদা ও বাগদা চিংড়ির হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা, চাষ ব্যবস্থাপনা, পোনা প্রতিপালন ও পোনা পরিবহন বিষয়ে ৬ টি প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশব্যাপী ধান ক্ষেতে মাছ চাষের বিপুল সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ বিষয়ে একটি প্যাকেজ প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও নতুন প্রযুক্তি হিসাবে পেনে মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, বাওড় মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র প্লাবনভূমিতে চাষভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন এবং পিটুইটারী গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ কয়েকটি প্যাকেজ রয়েছে ।

মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন উপ-খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়নকৃত প্যাকেজগুলো হলো ঃ

১. কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ
২. কার্প হ্যাচারী নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা
৩. কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ
৪. রুইজাতীয় মাছের পোনা প্রতিপালন
৫. রুইজাতীয় মাছের পোনা পরিবহন
৬.গলদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা
৭.গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন
৮.গলদা চিংড়ির হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা
৯.চিংড়ির পোনা পরিবহন
১০.বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা
১১. বাগদা চিংড়ির হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা
১২. সরপুঁটি মাছের চাষ
১৩. নাইলোটিকার চাষ
১৪. বিদেশী মাগুর মাছের চাষ
১৫. সমন্বিত মাছ চাষ
১৬. পাংগাশ মাছের চাষ ও হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা

১৭. খাঁচায় মাছ চাষ
১৮. ধান ক্ষেতে মাছ চাষ
১৯. পেনে মাছ চাষ
২০.ক্ষুদ্র প্লাবন ভূমিতে চাষভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা
২১. বাঁওড় মৎস্য ব্যবস্থাপনা
২২. মৎস্য খাদ্য উৎপাদন
২৩. পিজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

আর্থিক ও কারিগরিভাবে সফল পরীক্ষিত এসব প্রযুক্তিভিত্তিক প্যাকেজ বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা, আগ্রহী চাষী,মৎস্য ব্যাবসায়ীগণ এগুলো বাস্তবায়ন করে লাভবান হতে পারেন। দেশে বিদ্যমান পুঁজি বিনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে মৎস্য সেক্টরের এ সব উপখাতে বিনিয়োগ সার্বিক বিবেচনায় অত্যন্ত ফলপ্রসু এবং লাভজনক। কেননা-

- মাছ ও চিংড়িচাষ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম পুঁজি বিনিয়োগে লাভ বেশি।
- এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঝুঁকি কম।
- এ সব প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়নে লাগসই কারিগরি প্রযুক্তি সহজবোধ্য ও সহজলভ্য।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামাল দেশেই পাওয়া যায় এবং সহজপ্রাপ্য।
- বিনিয়োগকৃত অর্থ স্বল্প সময়ে ফেরত পাওয়া যায়।
- উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় বাজার চাহিদা প্রবল।
- সরকারি পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিদ্যমান।

বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন তথা মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্নভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। এর মধ্যে প্রযুক্তি প্যাকেজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুযায়ী আগ্রহী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ক্ষেত্র চি তকরণ, প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, সেগুলোর প্রয়োগে সার্বিক সহায়তা প্রদান, গৃহীত কার্যক্রম পরীবিক্ষণ ইত্যাদি অন্যতম।

মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহ যথা জেলা ও থানা মৎস্য কর্মকর্তা এবং খামার ব্যবস্থাপকের কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে আগ্রহী উদ্যোক্তা এবং মাছ ও চিংড়ি চাষীদের বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তা এবং মাছ ও চিংড়ি চাষীগণ সংশ্লিষ্ট থানা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে নাম তালিকাভূক্ত করত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রয়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যাংক এবং অর্থলগ্নীকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে ঋণ গ্রহণ পূর্বক মৎস্যচাষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

মাঠ পর্যায়ে মৎস্য বিষয়ক প্যাকেজ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই সরকারকর্তৃক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে প্যাকেজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্যোক্তাকর্তৃক প্যাকেজ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

আশা করা যায় মৎস্য সেক্টরের মত একটি উপযোগী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তা ও মৎস্যচাষীগণ পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন। এ সেক্টরে বিনিয়োগের ফলে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে উঠবে।

মাছ চাষের সহজ কলা-কৌশল

মোঃ জহিরুল হক
ক্ষেত্র সহকারী
মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ চাষের সম্প্রসারণ, মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার । পতিত জলাশয়ে মাছ চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা । দেশে অভাবনীয় আমিষ ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থানে মৎস্য চাষের ভূমিকা অনস্বীকার্য । বর্তমান ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাছের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় এখন শুধুমাত্র প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে ।

এ ব্যাপারে অনেক তৎপরতা দেখা যায় এবং অনেকেই মাছ চাষে এগিয়ে এসেছেন । এটা শুভ লক্ষণ এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপ । সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কারিগরি পদ্ধতি প্রচার ও প্রয়োগ করে থাকি । আমরা যদি স্বল্প ব্যয়ে সহজ পদ্ধতি জনগণের নিকট পৌছতে পারি, তা হলেই মূল লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হবে । মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় থানা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্পের অনুসৃত পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ আহরিত মাছের পরিমাণ বছরে হেক্টর প্রতি ৬-৭ টন অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ২০ মণ ।

পুকুর মালিকদের মৎস্য চাষে উৎসাহিত করা, উৎপাদন ব্যয় ও আয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করাও এ ক্ষেত্রে জরুরী বিষয় । থানা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে প্রথমে ফলাফল প্রদর্শক হিসাবে মৎস্য চাষী নির্বাচন করে উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয় । ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষী আবার ৫ থেকে ১০জন সহযোগি মৎস্যচাষী নির্বাচন কবে তাদের নিকট উক্ত প্রযুক্তি মৎস্য বিভাগের সহায়তায় হস্তান্তর করেন । এমনিভাবে যদি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে, তাহলে দেখা যায় যে পরবর্তী ৭ (সাত) বছরে অর্থাৎ ২০০৫ সালের ভেতর বাংলাদেশে কোন পতিত ডোবা, পুকুর অনাবাদি থাকবে না। দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাছের যে চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, তাই এই আমিষের অভাব পূরণের জন্য দেশে যেমন সপ্তাহে একদিন গবধঃষবংং ফধু পালন করা হয় । তেমনি যদি ঋরংযষবংং ফধু অর্থাৎ সারা দেশে সপ্তাহে ১দিন নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর ইত্যাদিতে মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়, তাহলে কিছুটা মাছের অভাব ঘুচবে বলে আশা করা যায় ।

মাছ চাষের সহজ পদ্ধতি

মানুষের যেমন বেঁচে থাকার জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এর প্রয়োজন তেমনি মাছের ও বাসস্থান অর্থাৎ পুকুর এবং খাদ্য প্রয়োজন । খাদ্য ছাড়া মানুষ কিছু দিন বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া মানুষ কয়েক মিনিট ও বেঁচে থাকতে পারে না । তেমনি মাছের বেলায়ও অক্সিজেন অতি জরুরী । যদি মাছকে খাদ্য সরবরাহ না করা হয়, তাহলে মাছের দেহ বাড়বে না এবং আস্তে আস্তে মাছ দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে মারা যাবে । কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া মাছও মানুষ কয়েক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না । মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে পানি থেকে আর মানুষ অক্সিজেন পায় বাতাস থেকে । কাজেই অক্সিজেন ছাড়া কিছুই বাঁচতে পারে না এবং মাছ চাষের সুফল আশা করা যায় না । গাছ পালা সূর্যের আলোর সাহায্যে অক্সিজেন তৈরী করে, তা আমরা বাতাস থেকে গ্রহণ করি । তদ্রুপ অক্সিজেনও পুকুরের পানিতে সূর্যের আলোতে উদ্ভিদকণা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ দ্বারা সৃষ্টি হয়, বাতাস থেকেও কিছু অক্সিজেন পানিতে মিশে এবং এই অক্সিজেন মাছ গ্রহণ করে থাকে।

পুকুরে যদি আমরা খাদ্য জন্মানোর চাষ করি, তাহলে ঐ খাদ্য খেয়ে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়বে । তাই আগে জানা দরকার কি ভাবে পুকুরে খাদ্য জন্মাতে হবে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ কণা পানিতে জন্মায় । এই উদ্ভিদ কণাগুলো এতই ছোট যে,

খালি চোখে দেখা যায় না । যখন এ ক্ষুদ্র উদ্ভিদগুলি অতিমাত্রায় পানিতে জন্মায় । তখন পানি সবুজ রং ধারণ করে । এই উদ্ভিদ কণাগুলি পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে । এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদগুলো সূর্যের আলোর সাহায্যে পানিতে অক্সিজেন তৈরী করে এবং মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে ব্যব ত হয় । আমরা যদি পুকুরে এই সব উদ্ভিদের চাষ করি, তাহলে এরা পুকুরে মাছের চাহিদা পুরণ করবে এবং মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবেও ব্যব ত হবে ।

ধান চাষের জন্য যেমন পানি, জৈব ও অজৈব সার ও সূর্যের আলোর দরকার হয় তেমনি এ সুক্ষ্ম উদ্ভিদ কণাকে জন্মাতেও পানি জৈব ও অজৈব সার এবং পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর দরকার । আগাছাপূর্ণ ধান ক্ষেতে যেমন ফসল ভাল হয় না তেমনি জলজ আগাছা ভর্তি পুকুরেও উদ্ভিদ কণা জন্মায় না এবং মাছের ফলন ভাল হয় না । গাছের তলায় যেমন ধান চাষ হয় না, তেমনি ছায়াযুক্ত পুকুরেও আশানুরূপ মাছের প্রাকৃতিক খাবারের ফলন বড়ে না । পুকুরে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে তাই পুকুরের পাড়ের গাছের ডাল পালা কেটে ফেলতে হবে ।

রাক্ষুসে মাছ ছোট ছোট মাছ পুকুরের পানি নিস্কাশন করে পকুর থেকে তুলে ফেলতে হবে । কারণ এরা পুকুরের খাদ্য ও অক্সিজেনে ভাগ বসায়, পুকুরে সেচ দেয়া একটি উত্তম পন্থা । সেচ দিয়ে পুকুরের তলদেশ ফাটল ধরা পর্যন্ত রেখে দিতে হবে । এতে করে পুকুরের তলায় বসবাসকারী অবাঞ্চিত মাছের ডিম থাকলে নষ্ট হবে এবং জীবাণুমুক্ত হবে । এবার পুকুরে ভালভাবে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে সবুজ সার অর্থাৎ ধনচে বা শন পাট বুনতে হবে । বৃষ্টির আগ পর্যন্ত এদের বাড়তে দিন । দুই-তিন ফুট লম্বা হলে এই গাছ কেটে ফেলতে হবে । দুই-তিন সপ্তাহ এগুলো তলায় ফেলে রেখে পুকুরে পানি দিতে হবে । এক সপ্তাহ পরে দেখবেন পুকুরের পানি বাদামী রঙের হয়েছে । তাতেই বুঝতে পারবেন আপনার পুকুরে মাছের খাদ্যের চাষ হয়েছে । পুকুর থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে গ্লাসটি হাতে করে সূর্যের আলোতে তাকান, দেখবেন গ্লাসের ভিতর অসংখ্য প্রাণিকণা দেখা যায় । পুকুরে প্রথমে উদ্ভিদকণা হয়, আর এগুলোর কিছু অংশ খেয়ে প্রাণিকণা বাড়তে থাকে । এটিই মাছের খাদ্য কণা ।

যদি পুকুর সেচ দিয়ে শুকানো সম্ভব না হয় তাহলে পুকুরের রক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্যবহার করতে পারেন ঃ

১. রোটেনন, ২. চা-বীজের পাউডার, ৩. ম য়ার খৈল, ৪. ব্লিচিং পাউডার, ৫. চুন ।

নিম্ন ছকের মাত্রা অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে ।

মাছ মারার জন্য ওষুধ প্রয়োগ

পানির আয়তন শতাংশে	পানির গভীরতা	ওষুধের পরিমান
১	৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট)	৩৫ গ্রাম রোটেনন পাউডার
১	৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট)	৯০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার
১	৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট)	৩ কেজি ম য়ার খৈল
১	৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট)	১ কেজি চুন

পুকুরের দৈর্ঘ, প্রস্থ ও পানির গড় গভীরতা জেনে ওষুধের মাত্রা ঠিক করে ঔষধ দিন । এক ঘন্টা পর মাছ ভেসে উঠলে সব মাছ ধরে ফেলুন । মাছ মারার জন্য চুন ব্যবহার করলে পরে আর চুন প্রয়োগ করতে হয় না । প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন দেবার ৭ থেকে ১০ দিন পর আপনার পুকুরে অজৈব সার দিন । ধান চাষের জন্য যেমন সারের দরকার তেমনি মাছ চাষের বেলায়ও পুকুরের পানিতে জৈব ও অজৈব সারের প্রয়োজন । সার পানিতে ভালভাবে গুলিয়ে তারপর পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

সারের পরিমাণ (পুকুর প্রস্তুতির সময়)

সারের নাম	শতাংশ প্রতি
গোবর	৫-৭ কেজি
হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা	৩-৫ কেজি
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টি.এস.পি.	৫০-৭৫ গ্রাম
এম.পি.	২০-৩০ গ্রাম

বিঃদ্রঃ- যে পরিমাণ সার পুকুর প্রস্তুতির সময় শতাংশ প্রতি দেয়া হয়েছে পোনা মাছ ছাড়ার পর সেই পরিমাণ সার প্রতি ৩৩ শতাংশে (বিঘা প্রতি) দিতে হবে ।

এ সার প্রয়োগের ৭ থেকে ১০ দিন পর দেখা যাবে, পুকুরের পানি সবুজ রং ধারণ করবে । অর্থাৎ পুকুরে উদ্ভিদকণা তৈরী হয়েছে। পানির রং সবুজ হলে আর সার দেয়ার দরকার নেই । এখন আপনি এক গ্লাস পুকুরের পানি নিন এবং তা সূর্যের আলোর দিকে ধরুন আপনি কিছু ক্ষুদ্র প্রাণী কাঁচের গ্লাসের পানিতে ঘুরাফেরা করতে দেখবেন । এ ক্ষুদে প্রাণীই জু-প্লাংটন বা প্রাণিকণা যা মাছের আমিষ জাতীয় খাদ্য । তখনই বুঝে নিবেন পুকুরে মাছের খাবার তৈরী হয়েছে । আপনি এখন পুকুরে উন্নতমানের পোনা মজুদের ব্যবস্থা করুন এবং ৪-৫ ইঞ্চি আকারের পোনা ছাড়ুন । এবার প্রতি শতাংশে ৩০টি পোনা মজুদ করুন । আর যদি পুকুরে সম্পুকে খাদ্য অর্থাৎ খৈল, কুঁড়া, ভুষি ইত্যাদি দিতে পারেন । তাহলে ৩০ থেকে ৪০টি পোনা প্রতি শতাংশে দিতে পারেন । পুকুরে বেশি পোনা ছাড়লে অক্সিজেন গ্রহণের ব্যাপারে ভীষণ অসুবিধা দেখা দিবে এবং অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা যাবে ।

পুকুরে নিম্মলিখিত স্তরে মাছ মজুদ করতে পারেন ঃ

১. উপরের স্তরে- কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প ।

২. মধ্যস্তরে- রুই ।

৩. নিচের স্তরে- মিরর কার্প, কমন কার্প, মৃগেল ।

৪. ঘাস খেকো- গ্রাস কার্প, সরপুঁটি ।

আর প্রতি শতাংশে ১টি করে চিতল মাছ দিতে পারলে ভাল হবে । কারণ এ চিতল পুকুরে ***পুলিশ মাছ*** হিসেবে কাজ করে। চিতল অচাষকৃত গুড়ামাছ খেয়ে ফেলে । শামুক দমনের জন্য একটি করে ব্লাক কার্প দিতে পারেন ।

এখন বাহির থেকে আনা পোনা প্রথমে পুকুরের এক বালতি পানিতে ২ থেকে ৩টি পোনা ছেড়ে পরীক্ষা করে নিন পানিতে কোন বিষক্রিয়া আছে কিনা । চব্বিশ ঘন্টা পর যদি দেখেন পোনার কোন পরিবর্তন দেখা না যায় তাহলে সমস্ত পোনাগুলি ১০ লিটার পরিমাণ এক বালতি পানিতে ২০০ গ্রাম লবণ বা ১ চা চামচ পটাশিয়াম দ্রবণে গোসল করিয়ে সাথে সাথে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে । এখন প্রতিদিন পুকুর জৈব ও অজৈব সার দিতে হবে । যে পরিমান সার পুকুর প্রস্তুতির সময় শতাংশ প্রতি দিয়ে ছিলেন এখন ৩৩ শতাংশের বিঘা প্রতি ঐ সমপরিমাণ মাত্রায় দিতে হবে । মাছের ভাল ফলন পেতে হলে সম্পূরক খাদ্য অর্থাৎ চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, সরিষার খৈল, ফিসমিল ইত্যাদি দিতে হবে । এগুলি আগের দিন ভিজিয়ে রেখে "মোয়া" আকারে পুকুরে ২-৩ জায়গায় ট্রেতে দিতে হবে । সাধারণত মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের শতকরা ২ ভাগ হাবে খাবার দিতে হবে । প্রতিমাসে পুকুরে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং মাছের ওজন দেখতে হবে, মাছ কি পরিমাণ বেড়েছে, সে হিসেবে খাদ্য দিতে হবে ।

চাষকৃত পুকুরে কখনও বাহির থেকে আসা পানি বিনা ছাকনিতে ঢুকতে দেবেন না । পুরাতন পুকুরের তলদেশে সাধারণতঃ কাদার পুরু স্তর থাকে, ফলে সেই পুকুরে অক্সিজেন কমে যায় এবং দুষিত গ্যাস জমে । পুকুরে মাঝে মাঝে হররা টেনে দিতে হবে । এতে পুকুরের বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যায় এবং অক্সিজেন বাড়াতে সাহায্য করে ।

এবার আপনি মাছের উচ্চ বাজার দর ও চাহিদার খোঁজ খবর রেখে পুকুরের মাছ বাজারজাত করতে পারেন এবং আপনার মূল্যবান মুদ্রা হাতের মুঠোয় নিতে পারেন । এ ভাবে আপনি মাছ চাষ করে লাভবান হবেন ।

মাছ চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্তিস্থান

	প্রতিষ্ঠানের ও নাম ঠিকানা	উপকরণের নাম
১.	বেঙ্গল ওভারসীজ লিঃ ২৮/এ, নয়াপল্টন (৪র্থ তলা) পূবালী ব্যাংক ভবন, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৪১৩১৬৭	পিজি, এইচ, সি.জি., সুমাছ আর্টিমিয়া, রোটেনন
২.	ক. হাবিবুর রহমান খাঁন খাঁন সন্স গ্রুপ সেনা কল্যাণ ভবন (১১ তলা) ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৩২৩৩৭, ২৩২৩৬৮	রোটেনন, আর্টিমিয়া
	খ. খাঁন ফিস ব্রিডিং এ্যান্ড রিসার্চ ইউ-১২, নূরজাহান রোড (৬ষ্ঠ তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	ফসটক্সিন টেবলেট, রোটেনন, আর্টিমিয়া
৩.	ফনিক্স পোলট্রি লিঃ ১৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০	ফটক্সিন টেবলেট
৪.	সেতু মার্কেটিং কর্পোরেশন ৬/সি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪৩৯৩৪, ২৪০৩৭৬	রোটেনন, সুমিথিয়ন, ডিপটারেক্স
৫.	সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিঃ ২১১, আউটার সার্কুলার রোড মগবাজার, ঢাকা ফোন ঃ ৮৩৪৫১০, ৮৩৪৫২৬	মাছ ও চিংড়ির তৈরী খাদ্য, টি, সিড কেক
৬.	প্রগতি ফিস লিমিটেড কে.ডি.এ. এ্যাভিনিউ, খুলনা ফোন ঃ ২২৩৬৭	ফিসমিল, ফিস পিলেট মাছ/চিংড়র খাদ্য, রোটেনন, টি সিড কেক
৭.	হালিম ফাউন্ডেশন ৩২, বঙ্গ বন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০	মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি
৮.	আব্দুর রশিদ মিয়া চামড়ার মোড়, চাচড়া, যশোহর	পিজি, এইচ, সি.জি., ফসট্কসিন
৯.	রোন-পুল্যাংক এগ্রোভেড বাংলাদেশ লিঃ ২৯, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৮৬২২৩১-২	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স
১০.	ক্রিসেন্ট গ্রুপ অফ কোম্পানীজ ৩৬, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪৫৪৭৬, ২৪২৯৬৯ (অ) ৮৩২২৩৬ (বা)	এরেটর

১১.	বাংলাদেশ এগ্রো-লাইভস্টক ফাউন্ডেশন ৯, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, হোটেল ডন প্লাজা (৪র্থ তলা), ঢাকা ফোন ঃ ২৩৭৩৯৩	ফিসমিল মাইক্রো ফার্টিলাইজার
১২.	ইতালী এগ্রিকালচার মিডিসিন ২১১/১ আলী, মার্কেট কুড়িল, চৌরাস্তা, বিশ্ব রোড ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২১২ ফোন ঃ ৬১০৮৮০	মোল্ট-৭, এম.এইচ.-১০ (জৈব রাসায়নিক সার)
১৩.	এগ্রোসার্ভ রেড ক্রিসেন্ট ভবন (৩য় তলা) ১১৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ফোন ঃ ২৫০০৭৫, ২৫৭৭৯২	মোল্ট-৭, এইচ-১০ (জৈব রাসায়নিক সার)
১৪.	টেকনোকমার্স ৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা জিপিও বক্স নং-২৭৪৬ ঢাকা-১০০০	হ্যাচারী যন্ত্রপাতি
১৫.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ২৪-২৫ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০	ফিসমিল, জাল
১৬.	মেসার্স হক এন্ড কোং এ-৩৪, বিসিক শিল্প নগরী, নরসিংদী	মাছের খাদ্য
১৭.	এ.ইন্ট্রাকো (বাংলাদেশ) লিঃ ১১৪ মতিঝিল বা/এ রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং (২য় তলা) ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৫৭৭৯২	মোল্ট-৭, এম.এইচ.-১০
১৮.	কাজী মহিউদ্দিন ১২/৬, সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১০২৭	পিজি.এইচ.সি.জি., সুমাছ, ফসটকসিন কুইকফস, রোটেনন, পলিথিন ব্যাগ, আর্টিমিয়া
১৯.	বানসিয়া ট্রেডিং কোং. ১৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা-১২০৭ ফোন ঃ ৩১৯১৮৬, ৮৬১৬৬২	এরেটর
২০.	ফিসকালচার এ্যান্ড পলট্রি ম্যানেজমেন্ট করসালটেন্সি সার্ভিসেস কক্ষ নং-৩৭/ডি (৭ম তলা), ইষ্টার্ণ প্লাজা সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা	মাছ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান কেন্দ্র

২১.	আন্তরিক ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন কক্ষ নং-৯, সায়েদা কোর্ট (২য় তলা) ২৮, আগ্রাবাদ বা/এ, জিপিও বক্স নং-১৩১১ চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন ঃ (০৩১) ২২৫১৭৭	এরেটর
২২.	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র আই/১, গ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ফোন ঃ ৮০৩৩৯৮, ৮০৫৮১২	গলদা চিংড়ির পোনা
২৩.	সেমকো ৬/সি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪৩৬৩৪, ২৪০৩৭৬	রোটেনন, এফ-অরগান, কেল্প মিল, সেকুফন-৮০ আর্টিমিয়া
২৪.	জেনেটিকা ১১৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা রেড ক্রিসেন্ট ভবন, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৯৫৫১৩১৩ (পরিশোধক এবং মাণনিয়ন্ত্রক)	মাইক্রো ব্যাকটার (পানি পরিশোধক), ষ্টেরিডোল-২০ (পানি দুষন নিয়ণন্ত্রক এবং মৎস্য রোগ প্রতিরোধক), মাইক্রো ব্লু (শৈবাল নাশক), মাইক্রে পার্ল, মোল্ট-৭ (চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সহায়ব সম্পুরক খাদ্য) এম.এইচ-১০ (পুকুরের মাছের খাদ্যের অভাব পূরণকারী) মৎস্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দ্রব্য
২৫.	প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ লিঃ ১৩/৫ আউটার সার্কুলার রোড রাজারবাগ, ঢাকা	চিংড়ি ও মাছের খাদ্যে ব্যব ত প্রিমিক্স
২৬.	লাকী ষ্টোরস কে.সি.ডে. রোড চট্টগ্রাম ফোন ঃ ২২৩১১০	

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

ক. ঢাকা

ক্রমিক	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পি এ বি এক্স	সরাসরি	

ক.১. মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় (পি এ বি এক্স ঃ ৮৬ ৩৬৩৯ - ৪৩, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০ - ২ - ৮৬ ১১৭)

১.	শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	২৭৫২	৮৬২৪৩০, ৪৬১৫৫৫	৮৪ ২৮১৮
২.	জনাব সৈয়দ আতাউর রহমান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	২৮৫০	৮৬ ৩৯৩০	৯১২০৬৮৩
৩.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	২৮৪২	৮৬ ৪৭০২	৮৩ ৭২০৯
৪.	জনাব এ.এফ.এম. আমিনুল ইসলাম, তথ্য অফিসার	২০৫৫	৮৬ ২৫১৬	৯১২ ০০৩১
৫.	জনাব আইয়ুব কাদরী, সচিব	২৭২৮	৮৬ ৪৭০০	৯১২ ৮১৪২
৬.	জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ, সচিবের একান্ত সচিব	২৮৭৬	৮৬ ১২৫৮	৯৩৩ ১৭৯২
৭.	জনাব সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, যুগ্মসচিব	৩৭২৩	৮৬ ৬২৬৩	৮২ ২২৩২
৮.	যুগ্মসচিব (মৎস্য)	-	৮৬ ১৯৭৭	-
৯.	জনাব আজিজুল করিম, যুগ্মপ্রধান	২৪৭১	৮৬ ৭৯৬৯	৯১২ ০৭১১
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, উপসচিব	২০৭৫	৮৬ ৯৫৬৫	৯৩৩ ৬৯৩৬
১১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই, উপসচিব	৩৭১৫	৮৬ ৯৫৬৪	৪০ ৬০০৪
১২.	জনাব আবু মোহাম্মদ, উপপ্রধান	৩৭৫২	৮৬ ২৭৮৩	৫০ ৯৩১৪

ক.২. মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ১ পার্ক এ্যাভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১০০০ (পি এ বি এক্স ঃ ৯৫৬ ৫০২১ - ৩, ৯৫৬ ৬১০৩ - ৪ ; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০ - ২ - ৯৫৬ ৮৩৯৩) ঃ

কক্ষ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পি এ বি এক্স	সরাসরি	
১০৪	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, মহাপরিচালক	০১	৯৫৬ ২৮৬১	৯১১ ৫৯১১
১০৫	জনাব মোঃ ইউনুস, মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী	০০৮	-	-
১০৭	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, পরিচালক (সামুদ্রিক)	০২	৯৫৬১৩৫৫,	৫০৯ ০০২
১০৮	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৫	৯৫৬ ৭২১৯	৫০০ ৩২৫
১০৩	জনাব ফয়জুল করিম	-	৯৫৬ ৯৩২০	-
১১১	লাইব্রেরী	০৪	-	-
.	জনাব মোঃ ইদ্রিস, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬	-	-
.	জনাব আ.ন.ম. বদরুদ্দোজা (প্রশাসন-১)	০৭	-	-
.	জনাব মোস্তফা (সাধারণ শাখা)	-	৯৫৬ ০৫১৭	-

ক্রমিক	নাম ও পদবী		টেলিফোন নম্বর	
			অফিস	বাসা
৩০৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক		- ৯৫৬ ১৫৯২	-
৩০৬	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান		০০৪ ৯৫৬ ১৪৩৭	৯১২ ৫৪১৯
৩০৭	জনাব আবুবকর শিকদার, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০০৬	৯৫৬ ০৫২৪	-
৩০৯	জনাব সামসুল ইসলাম খান, উপপরিচালক		- ৯৫৫ ৩০৮৮	-
৩১০	জনাব এ.কে.বর্মন, নির্বাহী প্রকৌশলী		- ৯৫৫ ৫৩৫১	-
৩১১	জনাব আব্দুল্লাহ জাহিদ, উপসহকারী পরিচালক	৮	-	-
৩১২	বেগম আখতার জাহান চৌধুরী, গবেষণা কর্মকর্তা		০০৯ -	৯৬৬ ২৭৯০
৩১৫	জনাব মাসুদ সিদ্দিক, উপসহকারী পরিচালক		৩ -	৯০০ ২০৪৭
৩১৬	জনাব এ.জেড.এম. ওবায়দুল হক, উপপ্রধান		০৮ -	-
৩২০	বেগম ফরিদা বেগম, সহকারী পরিচালক		- ৯৫৫ ২১৭৯	৯১১ ৯৪৮২
৩২১	জনাব মোঃ নূরুল আমিন, গবেষণা কর্মকর্তা		০০৫ -	-
৩২৫	জনাব মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ, উপপ্রধান		- ৯৫৬ ৯৯৪৩	-
৪২২	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা		০৯ ৯৫৫ ৪৯৯২	৯৫৬ ৮১২৫
৪০২	ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন, উপপ্রধান		০৩ ৯৫৬ ০৫৪৩	৯০০ ৭৯০২
৪০৪	জনাব এম.এ. কাফি, নির্বাহী প্রকৌশলী		- ৯৫৬ ০৫২৬	৯১১ ০৪৭৫
৪১০	জনাব মোঃ মোজাহার আলী, উপপরিচালক		০০৩ ৯৫৬ ৭২১৭	৯০০ ৪৬২৯
৪১৩	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক		- ৯৫৬ ১৬৮৫	৮১ ৭০৫৭
৫০৬	জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, উপপরিচালক		- ৯৫৫ ০৮২২	৯০০ ৭৮৭৫
৬০৩	পরিচালক, মৎস্য একাডেমী		০০১ ৯৫৬ ৯৯৩৪	-
৬০২	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপপরিচালক, মৎস্য একাডেমী		৪ ৯৫৬ ০৬৫৩	৪১ ৬২৮৫
৬০৪	জনাব রাখাল চন্দ্র কংস বনিক, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা		- ৯৫৫ ৪৮৬৭	-
৭০৪	জনাব এ.কে.এম. ইয়াহিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী		- ৯৫৬ ৭২১৮	৮৩ ৫৭২৯
৭০৯	জনাব এ.জে.এম. বদরুল হাসান, উর্ধতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা		৬ ৯৫৫ ৫৩৪৯	-
৭১৩	জনাব সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা		০০৭ ৯৫৬ ৭২১৬	৩২ ৭৩৬৯
৭১৮	জনাব এস.এম. নাজমুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক		০৫ ৯৫৫ ৪৭১৭	৩২ ৭৩৮৭
৮২০	জনাব অর্জুন চন্দ্র চন্দ, সহকারী পরিচালক		- ৯৫৬ ৭২২০	৫০ ৪৮০৮
.	প্রকল্প পরিচালক, এফসিডিআই		- ৯৫৫৪৮৭৫, ৯৫৬০৪৭২	-
.	জনাব মোঃ শহিদুর রহমান, উপপরিচালক, এফসিডিআই		- ৯৫৫ ৪৮৩৬	-
.	ডাঃ এম.এ. কাদের, উপপরিচালক, এফসিডিআই		- ৯৫৫ ৪৬৯৫	-
১০০৪	জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (মুক্তজলাশয়)		- ৯৫৬ ০৫২৫	৪১ ২৯২৪
১০০৫	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা		- ৯৫৫ ৮৮৮৩	-
১১০৭	জনাব মোঃ বজলুর রহমান, উপপরিচালক		৭ ৯৬৬ ৬১৭৪	-
ঢাকা মহানগরী ঃ	প্রকল্প পরিচালক, ইফাদেপ, গুলশান	-	৮৭ ১৭৪৯	৯১২ ১৭৩২
	ধানমন্ডি লেক		- ৯১১ ৮৩৭৪	-
	গুলশান লেক		- ৬০ ০৩১৯	-
ক.৩.	বাফরু, গুলশান			৮৮ ২৫৯৮
ক.৪.	মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর			৯১১ ৬৫৮৫
				৯১২৬১৮৫
ক.৫.	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি (ফ্যাক্স ঃ ৮৮০ - ২ - ৯৫৬ ৩৯৯০)			৯৫৬ ৯০৮৬

খ. ঢাকা বহির্ভূত ঃ

ক্রমিক নং	জেলা		দপ্তর	টেলিফোন নম্বর (এন ডব্লিও ডি)
১.	কক্সবাজার	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৩৪১) ৩২৬৮
				- (০৩৪১) ৩২৬৮ বা
		:	সামুদ্রিক মৎস্য	- (০৩৪১) ৩৬২০
		:	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এডিবি	- (০৩৪১) ৪৫৪৩
		:	উপপ্রকল্প পরিচালক, আইডিএ	- (০৩৪১) ৩৩৫৬
		:	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এফআরআই	- (০৩৪১) ৩৮৫৫
				- (০৩৪১) ৩২২৭ বা
২.	কিশোরগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৯৪১) ৪৬৭
				- (০৯৪১) ৩৯২ বা
		:	খামারব্যবস্থাপক	- (০৯৪১) ৩৪৭
৩.	কুমিল্লা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৮১) ৬১৫১
		:	উপপরিচালক (মৎস্য)	- (০৮১) ৬১২৭
				- (০৮১) ৫৬৫২ বা
		:	সহকারী পরিচালক	- (০৮১) ৬৫১১
		:	খামার ব্যবস্থাপক, জাঙ্গালিয়া	- (০৮১) ৬৫৪২
৪.	কুড়িগ্রাম	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৫৮১) ৫০১
৫.	কুষ্টিয়া	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৭১) ৫৪১
		:	খামারব্যবস্থাপক	- (০৭১) ৫৪১৮৯
৬.	খাগড়াছড়ি	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৩৭১) ৭২৬
৭.	খুলনা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- (০৪১) ৭৬৩০১৬
				- (০৪১) ৭৬০২২৪
		:	উপপরিচালক (মৎস্য)	- (০৪১) ৭৬২৬৩৫
				- (০৪১) ৭৬২২৪৩
				- (০৪১)৭৬২৩০৪বা
				- (০৪১) ৭৬২১৮১
		:	সিঃ সহকারী পরিচালক	- (০৪১) ৭৬১৭৫৯
		:	চিংড়ি সেল	- (০৪১) ৭৬২১৮৬
		:	উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	- (০৪১) ৭২০৬৪৮
		:	খামার ব্যবস্থাপক	- (০৪১) ৭২৩৪৯১
৮.	গাজীপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬৮১) ২৫২০
		:	খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	-(০২) ৬৯০২০৭
৯.	গাইবান্ধা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৪১)৬৪৩
১০.	গোপালগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪২৩)৪৫৪
১১.	চট্টগ্রাম	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৩১)৬৫০৬০৯
		:	উপপরিচালক (সামুদ্রিক)	- (০৩১)৭২০৮২৪
				-(০৩১)৭২১৭৩১
				-(০৩১)৭১০০৫৭
		:	সহকারী পরিচালক (সামুদ্রিক)	- (০৩১)৭২০৯১৮
		:	সহকারী পরিচালক (সামুদ্রিক)	- (০৩১)৭২৩৮৫০
		:	সামুদ্রিক উৎপাদন কর্মকর্তা	- (০৩১)৭২১৩০২
		:	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সামুদ্রিক)	- (০৩১)৭২০২৪৬
		:	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সামুদ্রিক জরিপ)	- (০৩১)৭২৪২০৬
				-(০৩১)৭২৩৮৭৩ বা
				-(০৩১)৭২৪৪৩৮

ক্রমিক নং	জেলা		দপ্তর	টেলিফোন নম্বর (এন ডব্লি ডি)
		:	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সামুদ্রিক জরিপ)	- (০৩১)৫০২৫০৬
		:	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সামুদ্রিক জরিপ)	- (০৩১)৫০২৭০২
		:	স্কীপার (অনুসন্ধানী)	- (০৩১)৭১২৬২৭বা
		:	ইঞ্জিনিয়ার (অনুসন্ধানী)	- (০৩১)৭১৩০৮২বা
		:	উপপরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	- (০৩১)৬৮২৬০৩
১২.	চাঁদপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৮৪১)৩১৬৫
		:	মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-(০৮৪১)৩৪০২
		:	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফআরআই)	- (০৮৪১)৩৪০৭
				-(০৮৪১)৩১৩২ বা
১৩.	চুয়াডাংগা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৬১)২৩৮৮
১৪.	জয়পুরহাট	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৭১)২২৪
১৫.	জামালপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৯৮১)৩৬২০
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৯৮১)৩৩৫২
১৬.	ঝালকাঠি	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৯৬)৫৫৮
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৪৯৬)৩০৯
১৭.	ঝিনাইদহ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৫১)২৮৫৭
		:	বাওড় হ্যাচারী	-(০৪২১)৫৯৮০
১৮.	টাঙ্গাইল	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৯২১)৩৬৭৮
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৯২১)৪০৭১
		:	প্রকল্প পরিচালক (যমুনা ব্রীজ-মৎস্য অঙ্গ)	-(০৯২১)৪০৬৩
১৯.	ঠাকুরগাঁও	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৬১)৩৪৬৩
২০.	ঢাকা	:	মৎস্য ভবন	-(০২ : ৯৫৬ ৫০২১-৩, ৯৫৬ ৬১০৩-৪)
২১.	দিনাজপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৩১)৩২৫৭
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৫৩১)৩৩১৫
২২.	নওগাঁ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৪১)২৩৮৫
২৩.	নবাবগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৮১)৪৮২
২৪.	নড়াইল	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৮১)৫১৩
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৪৮১)৩৮৯
২৫.	নরসিংদী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬২১)২৪১০
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৬২১)২৪৫২
২৬.	নারায়নগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০২)৯৭১ ৬৪৩০
২৭.	নাটোর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৭১)৫৯০
২৮.	নেত্রকোনা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৯৫১)৪০৪
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৯৫১)৩৫৫
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৯৫১)৫০৪
২৯.	নোয়াখালী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৩২১)৫৬৮১
				-(০৩২১)৬৩২১ বা
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	-(০৩২২৩)৩৮৪
		:	খামার ব্যবস্থাপক, চৌমুহনী	-(০৩২১)৩৯৬৭
৩০.	নিলফামারী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৫১)৫৭০
৩১.	পটুয়াখালী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৪১)২৫০১
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৪৪১)২৪৬৯
৩২.	পঞ্চগড়	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৬২)৩৬৯
৩৩.	পাবনা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৩১)৬০৬৮
		:	খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	-(০৭৩২)৪২৭

ক্রমিক নং	জেলা		দপ্তর	টেলিফোন নম্বর (এন ডব্লিও ডি)
৩৪.	পিরোজপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৬১)৫৯৭
৩৫.	ফরিদপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬৩১)৩২২৩
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৬৩১)৩৩২১
		:	মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-(০৬৩১)২৪৫৭
৩৬.	ফেনী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৩৩১)৭৪০৪৬
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৩৩১)৭৪২৩২
৩৭.	বগুড়া	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫১)৭৩৬৪১
৩৮.	বরগুনা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৪৬)৩৯৬
৩৯.	বরিশাল	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৩১)৫২৯১৮
		:	উপপরিচালক (মৎস্য)	-(০৪৩১)৫২৭২৭
		:	সহকারী পরিচালক	-(০৪৩১)৫৩১২৯
		:	খামার ব্যবস্থাপক, কাশিপুর	-(০৪৩১)৫৩১১৪
৪০.	বাগেরহাট	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪০১)৪৪৫
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, মংলা	-(০৪০২)৪০৭
৪১.	বান্দরবন	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৩৬১)৩৩৮
৪২.	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৮৫১)৫২৫০১
				-(০৮৫১)৫৩৭৮৫ বা
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৮৫১)৫৩০১৫
৪৩.	ভোলা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৯১)৪০৭
৪৪.	ময়মনসিংহ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৯১)৫৪৭৪৮
		:	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	-(০৯১)৫২১৫০
		:	খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	-(০৯১)৫৪১৫৮
		:	প্রকল্প পরিচালক, ডানিডা	-(০৯১)৫৩৮৮৭
				-(০৯১)৫৪৫২২
				-(০৯১)৫৫৩১৮
		:	মহাপরিচালক (এফআরআই)	-(০৯১)৫৪৮৭৪
				-(০৯১)৫৫৪১০ বা
		:	অতিরিক্ত পরিচালক (এফআরআই)	-(০৯১)৫৪৪১০
				-(০৯১)৫৪২৯২ বা
				-(০৯১)৫৪৮৭৪
৪৫.	মাগুড়া	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬১১)৩৪১
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৬১১)৮৫১
৪৬.	মাদারীপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬৬১)৪৪২
৪৭.	মানিকগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬৫১)৩৯১
৪৮.	মুন্সীগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬৯১)২৫৯১
৪৯.	মেহেরপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৯১)৫৪৩
৫০.	মৌলভীবাজার	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৮৬১)৫২৮১৩
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৮৬১)৫২২৯২
৫১.	যশোর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪২১)৫৭৫২
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৪২১)৪০৪৬

ক্রমিক নং	জেলা		দপ্তর	টেলিফোন নম্বর (এন ডব্লিও ডি)
		:	প্রকল্প পরিচালক, বাওড়	-(০৪২১)৭২৫২৯
				-(০৪২১)৩১০৮
				-(০৪২১)৬৪০২
		:	নির্বাহী প্রকৌশলী	-(০৪২১)৭২৫২৮
৫২.	রংপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫২১)২৯২৯
৫৩.	রাজশাহী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭২১)৭৬০২৪৫
		:	উপপরিচালক (মৎস্য)	-(০৭২১)৭৬০১৮৪
				-(০৭২১)৭৫০৭৮২
		:	সিঃ সহকারী পরিচালক, ৩য় মৎস্য	-(০৭২১)৭৬১৯৪৬
৫৪.	রাজবাড়ী	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬৪১)৫৮৩
		:	খামার ব্যবস্থাপক	-(০৬৪১)৩৬৪
৫৫.	রাঙ্গামাটি	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৩৫১)২৩২৭
৫৬.	লক্ষীপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৩৮১)৪৬৫
		:	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রায়পুর)	-(০৩৮১)২৩৭, ২০৮ /৩৭, ৩৯
৫৭.	লালমনিরহাট	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৫৯১)৩৪৬
৫৮.	শরিয়তপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৬০১)৬৫৬
৫৯.	শেরপুর	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৯৩১)৪৪৭
৬০.	সাতক্ষীরা	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৪৭১)৩৩১৮
৬১.	সিলেট	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৮২১)৭১৬২৪১
				-(০৮২১)৭১২৩৬৪
		:	উপপরিচালক, ২য় মৎস্য	-(০৮২১)৭১২৩৬৭
		:	খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	-(০৮২১)৭৬০৮৩৬
৬২.	সিরাজগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৭৫১)৭২১৩৭
৬৩.	সুনামগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৮৭১)৪৯০
৬৪.	হবিগঞ্জ	:	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-(০৮৩১)২৫৪০

মৎস্য সপ্তাহ' ৯৭ -এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

তারিখ ও দিন	কর্মসূচী	স্থান	সময়	বাস্তবায়নে
উদ্বোধনী দিনের পূর্বের দিন ১৫-০৯-৯৭ইং সোমবার	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলন ।	সম্মেলনকক্ষ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	১৬ : ০০ ঘ:	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
১৬-০৯-৯৭ইং মঙ্গলবার	উদ্বোধনী দিনে বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকায় ক্রোড় পত্র প্রকাশ	-	-	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
	মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক র‍্যালী অনুষ্ঠান	মৎস্য ভবন হতে সচিবালয় প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রেসক্লাব পর্যন্ত	০৭ : ৩০ ঘ:	মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী সমিতি, মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর
	মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর উদ্বোধন, পুরস্কার বিতরণ ও মৎস্য মেলা'৯৭ পরিদর্শন	বিএআরসি চত্বর, ফার্মগেইট, ঢাকা	১০ : ০০ ঘ:	মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
	মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক সংসদ ভবন লেকে পোনা মাছ অবমুক্তি	সংসদ ভবন লেক, ঢাকা	১১ : ২০ ঘ:	মৎস্য অধিদপ্তর
১৭-০৯-৯৭ইং বুধবার	পারিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গুলশান লেকে পোনা মাছ অবমুক্তি	গুলশান লেক ঢাকা	১০ : ০০ ঘ:	মৎস্য অধিদপ্তর
১৮-০৯-৯৭ইং বৃহস্পতিবার	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র কর্তৃক ডিএনডি খালে পোনামাছ অবমুক্তি	ডিএনডি খাল ঢাকা	১০ : ০০ ঘ:	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
১৯-০৯-৯৭ইং শুক্রবার	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ক্রিসেন্ট লেকে পোনামাছ অবমুক্তি	ক্রিসেন্ট লেক, সংসদ ভবন, ঢাকা	১০.০০ ঘ:	মৎস্য অধিদপ্তর
২০-০৯-৯৭ইং শনিবার	সেমিনার : মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা	মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ	১০ : ০০ ঘ:	সেমিনার উপ-কমিটি ও মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট
২১-০৯-৯৭ইং রবিবার	সেমিনার : মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	বিএআরসি সম্মেলন কক্ষ, ফার্মগেইট, ঢাকা	১০ : ০০ ঘ:	সেমিনার উপ-কমিটি ও মৎস্য অধিদপ্তর
২২-০৯-৯৭ইং সোমবার	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সমাপনী অনুষ্ঠান	ঢাকা	১৯ : ৩০ ঘ:	মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, এফ.আর.আই., বি.এফ.ডি.সি., এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
• ১৬-২২শে সেপ্টেম্বর/৯৭ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান । • শ্লোগান, ব্যানার, পোষ্টার ও ডিসপ্লে বোর্ড দিয়ে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণ । • প্রত্যেহ রেডিও টিভিতে সপ্তাহ ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রচার ।				মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ পুরস্কার

পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	পুরস্কারের মান	পুরস্কার
মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে "প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা" প্রক্রিয়া	মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ময়মনসিংহ-২২০১, বাংলাদেশ (মহাপরিচালক ঃ ড: এম.এ.মজিদ)	১ম স্থান	স্বর্ন পদক
	আরবপুর ফিশ ফার্ম প্রোপ্রাইটর- জনাব আব্দুস ছালাম সরদার গ্রাম- আরবপুর, বিমান বন্দর সড়ক, যশোর সদর।	২য় স্থান	রৌপ্য পদক
মাছের রেণু উৎপাদন	যশোর ফিশ হ্যাচারী প্রোপ্রাইটর- জনাব মো: রেজাউল হক, যশোর সদর।	১ম স্থান	স্বর্ন পদক
	জনাব মো: আহসান হাবীব গ্রাম- বগইড়, থানা- ফেণী সদর, জেলা- ফেণী	২য় স্থান	রৌপ্য পদক
	ভাই ভাই ফিশ সীড প্ল্যান্ট প্রোপ্রাইটর- জনাব মো: তৈয়ব আলী গ্রাম- রাঘবপুর, ময়মনসিংহ সদর।	৩য় স্থান	ব্রোঞ্জ পদক
চিংড়ি (গলদা/বাগদা) পোনা উৎপাদন (পি.এল)	বেলী শ্রিম্প হ্যাচারী গ্রাম- কলাতলী, কক্সবাজার সদর।	১ম স্থান	স্বর্ন পদক
মাছের পোনা উৎপাদন	জননী মৎস্য খামার প্রোপ্রাইটর- জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ জেলা- গাজীপুর	১ম স্থান	স্বর্ন পদক
	জনাব মো: মাসুদুর রহমান (মিলন) গ্রাম- ডবাড় বেড়, থানা- শার্শা জেলা- যশোর	২য় স্থান	রৌপ্য পদক
	জনাব মো: শহিদুল ইসলাম গ্রাম- বাড়িয়া পাড়া থানা- বাগমারা, জেলা- রাজশাহী	৩য় স্থান	ব্রোঞ্জ পদক
মাছ উৎপাদন	জনাব মো: সালাউদ্দিন গাজী গ্রাম- কনকসার, থানা- লৌহজং, জেলা- মুন্সীগঞ্জ	১ম স্থান	স্বর্ন পদক
	জনাব মো: অহিদুজ্জামান ভূঁইয়া গ্রাম- কেমতলী, থানা- বরুড়া, জেলা- কুমিল্লা	২য় স্থান	রৌপ্য পদক
	জনাব মো: ফরিদ মিয়া গ্রাম- রামভদ, থানা- সুন্দর গঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধা	৩য় স্থান	ব্রোঞ্জ পদক
চিংড়ি উৎপাদন (চিংড়ি খামার/ ঘের)	জনাব এইচ.কে. আনোয়ার এলিট এ্যাকোয়াকালচার লি: জেলা- কক্সবাজার।	১ম স্থান	স্বর্ন পদক